কালিদাস

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিদাস

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৪৪

উৎসর্গ

রসজলধির পারঙ্গম মার্ম্মিক কবি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়

করকমলেষু

"—পরিণত মকরন্দ মার্ম্মিকাস্তে
জগতি ভবন্তু চিরায়ুষো মিলিন্দাঃ।"

কালিদাস

ফেড্ ইন্

একটি হস্তীর হরিচন্দন চিত্রিত, মস্তকের উপর ক্যামেরার চক্ষু উন্মোচিত হইল। ক্রমে হস্তীর পূর্ণ অবয়ব ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখা গেল।

একটি নগরীর জনাকীর্ণ পথ দিয়া হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত ; পৃষ্ঠের মহার্ঘ কারু-খচিত বস্ত্রাবরণের উপর ঘোষক বসিয়া পটহ বাজাইতেছে। ঘোষকের দুই হস্তে দুইটি মুষলাকৃতি পটহ-দণ্ড দ্রুতচ্ছন্দে পটহচর্ম্মের উপর আঘাত বৃষ্টি করিতেছে।

চারিদিকে নাগরিকের জনতা ; সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্য উৎসুক ঊর্দ্ধমুখে হস্তীর সহগমন করিতেছে। পথপার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্যগুলির গবাক্ষে অলিন্দে কুতূহলী পুরন্ধ্রীগণের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের সৃজন করিয়াছে। জনতার কলরব ও পটহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনি-বিপ্লব উত্থিত

ঘোষকের পটহ-ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হইল। ঘোষক দৃপ্তভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিতেই জনতার কল-মর্ম্মরও শান্ত হইয়া গেল। ঘোষক তখন শঙ্খের মত গভীর স্বরে ঘোষণা আরম্ভ করিল।

ঘোষক : ভো ভোঃ! শোনো সবাই!!—মহারাষ্ট্র কুন্তলের কুমার-ভট্টারিকা পরম বিদুষী রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবেন। সামন্ত-শ্রেষ্ঠী, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ কর…জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে এই স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে পারবে—

জনতার এক অংশে অবধূত নামধারী একজন অতি স্থূলকায় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ধামিতে মুড়ি লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিল, ঘোষণার শেষ অংশ শুনিয়া তাহার চরণ ও চর্ব্বণ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। সে বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্দ্ধে ঘোষকের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষক ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

ঘোষক : … রাজকুমারী প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে তিনটি প্রশ্ন করবেন—যে-ব্যক্তি যথার্থ উত্তর দিতে পারবে তারই গলায় কুমারী মালা দেবেন—

উপরোক্ত কথাগুলি শুনিবামাত্র অবধূত হস্ত-দন্তভাবে পিছু ফিরিয়া জনতা ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না।

জনতার অন্যত্র, ঝাড়ু ও চুপ্‌ড়ি হস্তে একটি হরিজন সম্মোহিতের মত দাঁড়াইয়া ঘোষণা শুনিতেছিল; অকস্মাৎ সে সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উচ্চ হর্ষধ্বনি করিয়া

উঠিল। তারপর ঝাড়ু চুপ্ড়ি সজোরে মাটিতে আছড়াইয়া সে তীরবেগে বিপরীত মুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এদিকে ঘোষকের জ্ঞাপনী তখন শেষ হইতেছে।

ঘোষক: আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কুন্তল রাজধানীতে স্বয়ংবর সভা বসবে। অবহিত হও—সকলে অবহিত হও!

ঘোষণাশেষে ঘোষক আবার মন্দ্র-ছন্দে পটহ ধ্বনিত করিল।

ডিজল্ভ্।

পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া দীর্ঘ বঙ্কিম পথ চলিয়া গিয়াছে; পথের অপর পাশে বহু নিম্নে সমুদ্র। সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্য-পথ।

পথের উপর সম্মুখেই একটি চতুর্দ্দোলা; আটজন হৃষ্টপুষ্ট বাহক উহা স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দোলায় স্থূলকায় অবধূত উপবিষ্ট; সে উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া একছড়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে।

পিছন হইতে এক সুবেশ অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। তাহার অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত অবধূত চতুর্দ্দোলা হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল। অশ্বারোহী দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অবধূতকে অতিক্রম করিয়া গেল। ইতিমধ্যে পিছনে আরও দুইজন অশ্বারোহী আসিতেছে দেখা গেল।

আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় অবধূত কদলী ভক্ষণ ভুলিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।

অবধূত: (বাহকগণের প্রতি) ওরে—ওরে—! তোরা মানুষ না বলদ্!—জল্দি চল্—জল্দি চল্—! সব বেটা এগিয়ে গেল!

নিম্নে সমুদ্রের কিনার বাহিয়া একটি ময়ূরপঙ্খী ভরা-পালে চলিয়াছে। ঝিকিমিকি রৌদ্র প্রতিফলিত নীল জলের উপর ময়ূরপঙ্খী মরালের মত ভাসিতেছে; পিছনে হাল ধরিয়া মাঝি দাঁড়াইয়া আছে।

কালিদাস

ময়ূরপঙ্খী হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

রূপ নগরীর রাজ-কুমারীর দেশে
চল্ রে ডিঙা মোর—চল্ রে ডিঙা ভেসে।
সোনার পালে বাতাস লেগেছে
পূর্ণিমাতে জোয়ার জেগেছে—
ভিড়্‌বে তরী রূপের ঘাটে
রূপনগরে এসে।
চল্ রে ডিঙা মোর—চল্ রে ডিঙা ভেসে

নানা পথ দিয়া নানা জাতীয় যান-বাহন বহু যাত্রীকে লইয়া কুন্তল-রাজধানীর অভিমুখে চলিয়াছে ; রাজপুত্রদের মাথায় রাজকীয় শিরস্ত্রাণ আপন আপন স্বতন্ত্র গঠনের বিচিত্রতায় শিরস্ত্রাণধারীদের পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছে। উচ্চপদস্থ সেনানীগণের বক্ষে লৌহজালিক, কটিতে তরবারি। কাহারও সঙ্গে অনুচর আছে ; কেহ একাকী যাইতেছে। এইরূপ কয়েকটি দৃশ্য দেখা গেল।

ডিজল্‌ভ্।

কানন মধ্যস্থ একটি জলাশয়। জলাশয়ের চারিপাশে কিছু দূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত ভূমি তারপর একটি-দুটি বড় বড় গাছ ; অতঃপর নিবিড় বনানীর শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। নিম্নে ছায়ান্ধকার ; উপরে দূর প্রসারী পল্লবপুঞ্জের উপর দ্বিপ্রহরের খর সূর্য্য-কিরণের প্রতিভাস।

কালিদাস

জলাশয়ের অনতিদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষ হইতে কাঠ্-ঠোকরা পাখীর আওয়াজের মত একটি শব্দ আসিতেছে—ঠক্-ঠক্ ঠক্-ঠক্—

শব্দ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে দেখা যায়—বৃক্ষের নিম্নতন একটি স্থূল শাখায় পা ঝুলাইয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে এবং যে-শাখায় বসিয়া আছে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। মানুষটি অল্প বয়স্ক; কুড়ির বেশী বয়স হইবে না। অতি সুন্দর গৌরকান্তি যুবা; মুখে শিশু-সুলভ সরলতা; হাসিটি নব-বিস্ময় ও কৌতুকে ভরা—যেন এইমাত্র কোন্ দৈব দুর্ব্বিপাকে এই বিস্ময়কর পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে সাংসারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাহার বিন্দুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

যুবকের ঊর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন; কেবল স্কন্ধে উপবীত আছে। যুবক আপন মনের আনন্দে হাসিতেছে ও একটি ক্ষুদ্র কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষ-শাখার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিতেছে। কুঠার-দণ্ডের প্রান্তেএকটি সূক্ষ্ম সূত্র সংলগ্ন।

যুবক মনের আনন্দে ডাল কাটিতেছে, সহসা অদূরে অন্য একপ্রকার শব্দ তাহার কানে আসিল, সে কুঠার নামাইয়া কৌতূহলভরে বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। যে শব্দ যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা বনভূমির শষ্পাস্তরণের উপর মন্দীভূত অশ্বক্ষুরধ্বনি।

যুবক দেখিল, জলাশয়ের পাশ দিয়া একটি অশ্বারোহী আসিতেছে; আসিতে আসিতে অশ্বারোহী ও ঘোটক উভয়েই সতৃষ্ণভাবে জলাশয়ের পানে ঘাড় বাঁকাইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। যেন ইচ্ছা, থামিয়া জল পান করে।

আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল, অশ্বারোহীর বেশভূষা ঘর্ম্মাক্ত ও ধূলিধূসর হইলেও রাজোচিত; অশ্বও তদনুরূপ। আরোহীর বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর; মাংসল দেহ, গো[illegible]কৃতি মাংসল মুখ। মুখে শাসক-সম্প্রদায়সুলভ আত্মাভিমান সুপরিস্ফুট।

ঘোটকটি কতক নিজ ইচ্ছানুসারেই ক্রমশ মন্দবেগ হইয়া শেষে সরোবরের

তীরে থামিয়া গিয়াছিল। আরোহীও মনে মনে বিচার করিতেছিল এখানে নামিয়া অজ্ঞাত জলাশয়ে জলপান করা সমীচীন হইবে কি-না। ওদিকে শাখারূঢ় যুবক পরম আগ্রহে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তন্ময়তাবশত তাহার কুঠার স্খলিত হইয়া ঝনৎকার শব্দে মাটিতে পড়িল।

চমকিয়া অশ্বারোহী ফিরিয়া দেখিল, গাছের উপর এক কাঠুরিয়া বসিয়া আছে। সে তখন অশ্বের মুখ ঘুরাইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

যুবক ততক্ষণ সূত্রের সাহায্যে ভূপতিত কুঠারটি টানিয়া তুলিয়া লইয়াছে। তাহার কুঠার বোধ হয় প্রায়ই পড়িয়া যায়, তাই উহা বিনা পরিশ্রমে উদ্ধার করিবার এই বালকোচিত কৌশল আবিষ্কার করিয়া যুবক গর্ব্বপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

অশ্বারোহী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব থামাইলেন। যুবকের কার্য্যকলাপ নিরুৎসুক অবজ্ঞাভরে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

অশ্বারোহী : তুই কে রে ?

সরল হাস্যে কাঠুরিয়ার মুখ ভরিয়া গেল ; সে সহজ অকপটতার সহিত উত্তর দিল—

কাঠুরিয়া : আমি কালিদাস—জঙ্গলের ঐ-ধারে ছোট্ট গাঁ আছে, ওখানে আমি থাকি। মামা বললেন—বামুনের ঘরের এঁড়ে, লেখাপড়া শিখলি না—যাঃ, জঙ্গলে কাঠ কেটে আন্‌গে যা। তাই কাঠ কাটছি।

অশ্বারোহীর মুখভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি কালিদাসকে পরিপক্ক বেকুব বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি কপালের ঘাম মুছিলেন—

অশ্বারোহী : কুন্তল-রাজধানী এখান থেকে কতদূর জানিস ?

কালিদাস : জানি। হেঁটে গেলে একদিনের পথ।

অশ্বারোহী যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন ; অশ্ব হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কতক নিজ মনেই বলিলেন—

অশ্বারোহী : তা হ'লে ঘোড়ার পিঠে দু'দণ্ডে যাওয়া যাবে—

কালিদাস বৃক্ষশাখায় বসিয়া সকৌতুকে আরোহীর অবরোহণ-ক্রিয়া দেখিলেন ; তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

কালিদাস : তুমি কে—?

অশ্বারোহী ভূপৃষ্ঠ হইতে তাচ্ছিল্যভরে একবার কালিদাসের পানে চোখ তুলিলেন।

অশ্বারোহী : আমি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ।

কালিদাসের ভাগ্যে রাজপুত্রদর্শন এই প্রথম। উত্তেজনায় তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া সংহতস্বরে তিনি বলিলেন—

কালিদাস : রাজপুত্তুর! কিন্তু তোমার মন্ত্রি-পুত্তুর কোটাল-পুত্তুর লোক-লস্কর—এরা সব কই ?

যুবরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন

যুবরাজ : আমার লোকলস্কর সব পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ; দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে আমি জঙ্গলের রাস্তা ধরেছি—

কালিদাস : তুমি বুঝি স্বয়ংবর-সভায় যাচ্ছ ?

যুবরাজ ঘাড় নাড়িলেন। ইতিমধ্যে তিনি ঘোড়াটিকে কালিদাসের ঠিক নীচে গাছের একটি উপশাখায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মস্তক হইতে ধাতুময় শিরস্ত্রাণটি মোচন করিয়া গাছের আর একটি গোঁজের মত ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন ঘর্ম্মার্দ্র কুর্ত্তাটি খুলিতে খুলিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—

যুবরাজ : নাইতে হবে—ঘামে ধুলোয় কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হয়ে গেছে। তোদের ঐ পুকুরটার জল কেমন ? ভাল ?

কালিদাস : হ্যাঁ—খুব ভাল।

কুর্ত্তা মাটিতে ফেলিয়া যুবরাজ নূতন বস্ত্রাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোড়ার পিঠে কম্বলাসনের নীচে বহুবিধ উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রাদি পাট করিযা রাখা ছিল ; কম্বল তুলিয়া সেগুলি একে একে বাহির করিয়া যুবরাজ ঘোড়ার পিঠের উপরেই সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য স্নান সারিয়া সেগুলি পরিধান পূর্ব্বক বরবেশে স্বয়ংবর-সভায় যাত্রা করিবেন।

যুবরাজ : স্বয়ংবর-সভায় যেতে হবে, যা-তা প'রে গেলে তো চলবে না—আজকালকার মেয়েদের আবার পোষাকের ওপর নজর বেশী। আমাব প্রথম রাণীকে যখন বিয়ে করেছিলুম তখন এত হাঙ্গামা ছিল না—

কালিদাস সহস্রচক্ষু হইয়া এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-বৈভব দেখিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—

কালিদাস : তোমার বুঝি অনেক রাণী ?

যুবরাজ অবহেলাভরে বলিলেন—

যুবরাজ : না—অনেক আর কই—সাতটি।

সোনালী জরির জুতাজোড়া গাছের তলায় খুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন—

যুবরাজ : হ্যাঁ গ্যাখ্—কি নাম তোর—কালিদাস ? শোন্, আমি পুকুরে নাইতে চললুম। তুই এ গুলোর ওপর নজর রাখিস—যেন জংলি কেউ এসে নিয়ে না পালায়—বুঝলি ?

কালিদাস ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। যুবরাজ আর বিলম্ব না করিয়া সরোবরের দিকে চলিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি ইতস্তত করিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। জুতাজোড়া মাটিতে পড়িয়া রহিল, কি জানি যদি শৃগালে লইয়া পলায়ন করে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জুতা দুইটি শিরস্ত্রাণের সঙ্গে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

গাছের উপর কালিদাস মুগ্ধ তন্ময়তার সহিত বিচিত্র সুন্দর আভরণগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যুবরাজ প্রস্থান করিবার পর তাহার চোখদুটি যুবরাজের দিকে দূরে সঞ্চারিত হইল, আবার বস্ত্রগুলির দিকে ফিরিয়া আসিল, আবার যুবরাজের দিকে প্রেরিত হইল—তারপর কালিদাস সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া শিরস্ত্রাণটি তুলিয়া লইলেন। মহানন্দে কিছুক্ষণ শিরস্ত্রাণটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার পর তিনি সেটি নিজ মস্তকে পরিধান করিলেন। বাঃ, একটুও তো

বড় হয় নাই, যেন তাহারই মাথার মাপে তৈয়ার হইয়াছিল। শাণিত কুঠার-ফলকে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া কালিদাসের সর্ব্বাঙ্গে উল্লসিত শিহরণ খেলিয়া গেল। অতঃপর জুতাজোড়াও কালিদাসের শ্রীচরণেষু হইল। আরে ! একটু আঁট হইয়াছে বটে কিন্তু বে-মানান্ হয় নাই।

ওদিকে যুবরাজ তখন এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া পরম আরামে স্নান করিতেছেন ; নাক টিপিয়া জলে ডুব দিতেছেন ; দুই হস্তে সবেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছেন। কালিদাসের দিকে তাঁহার নজর নাই।

কালিদাস কিন্তু ইতিমধ্যে—

ঘোড়ার পিঠের উপর বস্ত্রাভরণগুলি সাজানো ছিল, ঊর্দ্ধ হইতে একটি লোলুপ হস্ত আসিয়া বস্ত্রটি তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল ; কিছুক্ষণ পরে আবার উত্তরীয়টি অন্তর্হিত হইল—; তারপর আঙ্‌রাখা—

যুবরাজ ওদিকে আপন মনে স্নান করিয়া চলিয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গে রাজবেশ পরিয়া কালিদাসের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু রাজবেশ পরিয়া তো আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না ; একটা কিছু করা চাই। শাখারূঢ় কালিদাস হঠাৎ কুঠারটি তুলিয়া লইয়া খটাখট্ ডাল কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিম্নে ঘোড়াটি এই আকস্মিক শব্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শাখাটি ইতিপূর্ব্বেই বেশ জখম হইয়া ছিল, এই দ্বিতীয় আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শাখাটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলেও মড়্ মড়্ শব্দে নীচে নামিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল ; কালিদাসের হাত হইতে কুঠার ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ঘোড়াটা নীচে লাফালাফি সুরু করিয়াছিল, শাখাচ্যুত কালিদাস তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া

ভল্লুকের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভয়ার্ত্ত ঘোড়া মুখের এক ঝট্‌কায় বন্ধন ছিঁড়িয়া তীরবেগে একদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কালিদাস প্রাণপণে তাহাকে আঁক্‌ড়াইয়া রহিলেন।

স্নানরত যুবরাজের কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিতেই তিনি উচ্চকিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঘোর উদ্বেগে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া তিনি জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিক্তবস্ত্রে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অশ্ব কাঠুরিয়াকে পৃষ্ঠে লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বনের মধ্যে কালিদাস অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যুবরাজ হতভম্ব হইয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার সুবর্ত্তুল মুখে ক্রোধ ও হতাশার মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ব্যাঘ্রের মত একটি গর্জ্জন ছাড়িয়া দুই হস্ত ঊর্দ্ধে আস্ফালন করিতে করিতে যেন পলাতক ঘোটকের পশ্চাদ্ধাবন করিবার উদ্দেশ্যে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে এক পদও অগ্রসর হইতে হইল না। তাঁহার সিক্ত বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া মাটি কর্দ্দমিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ পা পিছলাইয়া সশব্দে মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট হইলেন।

ফেড্‌ আউট্‌।

ফেড্‌ ইন্‌।

কুন্তল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে সাধারণের উপভোগ্য নগরোদ্যান; উদ্যান ঘিরিয়া প্রশস্ত রাজপথ; রাজপথের অপর পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা, বিপণি, মদিরাগৃহ,—পতাকা ও তোরণ মাল্যে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

কালিদাস

নগরোদ্যানের কেন্দ্রে একটি অতি সুদৃশ্য মর্ম্মর নির্ম্মিত কন্দর্প-মন্দির ; মন্দিরের দেয়াল নাই, তাই বাহির হইতে কন্দর্প দেবের ধনুর্দ্ধর মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে নাগরিকদের উপবেশনের জন্য গোলাকৃতি প্রস্তর বেদিকা। উদ্যানের চারিপ্রান্তে চারিটি প্রস্রবণ ; উহার জল গো-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া বৃহৎ শ্বেত জলাধারে পড়িতেছে। এক ঝাঁক পারাবত উদ্যানের ভূমিতে বসিয়া নির্ভয়ে শস্য খুঁটিয়া খাইতেছে। কুঞ্জ বিতানে বাটিকায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া নব বসন্তের জয় ঘোষণা করিতেছে।

আজ মদনোৎসব ; তাহার উপর আবার রাজকন্যার স্বয়ংবর। নগরের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের সমাগমে নগরে সমারোহের অন্ত নাই।

উদ্যান ও রাজপথের মাঝখানে অগণিত ফুলের দোকান বসিয়াছে। দারু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিটি দণ্ডের উপর অবস্থিত ; তাহার মধ্যে রাশীকৃত ফুল। ফুলের রাশির মধ্যে এক একটি যুবতী মালিনী বসিয়া আছে ; বিম্বাধরে হাসিয়া বিলাসী নাগরিকদের পুষ্পমালা পুষ্পের অঙ্গদ কুণ্ডল শিরোভূষণ বিক্রয় করিতেছে।

পথে জনস্রোত আবর্ত্তিত। মাঝে মাঝে উষ্ট্রের সারি বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া উত্তুঙ্গ অবজ্ঞাভরে চলিয়াছে। দোলা চতুর্দ্দোলারও অভাব নাই, সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদের লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়াছে।

সহসা এই পথের উপর ক্ষণকালের জন্য এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। প্রধান পথটি হইতে কয়েকটি সঙ্কীর্ণতর পথ বাহির হইয়া গিয়াছিল ; এইরূপ একটি পথ হইতে প্রচণ্ড বেগে একটি উন্মত্ত অশ্ব আসিয়া প্রবেশ করিল—অশ্বের পৃষ্ঠে একটি আরোহী কোনও ক্রমে জুড়িয়া আছে। ক্ষিপ্ত অশ্ব দেখিয়া পথের জনতা সভয়ে চারিদিক ছিট্‌কাইয়া পড়িল। একটি ফুলের দোকানের সম্মুখ পর্য্যন্ত

ছুটিয়া গিয়া অশ্ব দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গতিবেগ সম্বরণ করিল, তারপর উগ্রবেগে ছুটিয়া আর একটা পথ দিয়া দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল।

অশ্ব ও আরোহী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। তাহারা অন্তর্হিত হইলে পথের কোলাহল ও উত্তেজনা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। যে ফুলের দোকানটিকে অশ্ববর প্রায় বিমর্দ্দিত করিয়া গিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাত্রী মালিনী এতক্ষণে ফুলের স্তূপের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া চাহিল। দোকানের সম্মুখে তিনটি নাগরিক ছিলেন, অশ্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন; এখন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন দোকানের নিম্নদেশ হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বেশভূষা কিছু অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংস্কার করিতে করিতে ও জানুর ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে এক ব্যক্তি সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রথম নাগরিক: বাবাঃ—রগ ঘেঁষে গেছে! আর একটু হলেই উচ্চৈঃশ্রবা বুকের ওপর পা চাপিয়ে দিয়েছিল আর কি!

দ্বিতীয় নাগরিক স্খলিত কর্ণভূষা আবার কর্ণে পরিধান
করিতেছিলেন, বিরক্তি-ভরে বলিলেন—

দ্বিতীয় নাগরিক: অনেক রাজা রাজকুমারই তো স্বয়ংবরে এসেছে কিন্তু এমন বেপরোয়া ঘোড়সোয়ার দেখিনি। ভাগ্যে শ্রীমতীর দোকানের তলায় ঢুকেছিলুম, নইলে মুণ্ডটি পিণ্ড ক'রে দিয়ে চলে যেতো!

দোকানের মালিনী এবার কথা কহিল, উৎসুকভাবে বলিল—

মালিনী: নিশ্চয় কোনও রাজকুমার! চিনতে পারলে না?

এতক্ষণে তৃতীয় নাগরিকটি, যেন কিছুমাত্র বিচলিত হ'ন নাই এমনিভাবে ফুলের পাখার বাতাস খাইতে খাইতে ফিরিয়া ,আসিলেন। মালিনীর প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিলেন ; অবজ্ঞায় ভ্রূ তুলিয়া অপর দুইজনের প্রতি দৃকপাত করিয়া বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে কহিলেন—

তৃতীয় নাগরিক : চোখ চেয়ে থাকলে তো চিনতে পারবে ! ঘোড়া দেখেই শ্রীমানদের পদ্মপলাশ নেত্র কমল-কোরকের মত মুদিত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় নাগরিক : আরে যাও যাও, তুমি তো দৌড় মেরেছিল। সরু সরু একযোড়া পা আছে কি-না—

মালিনীর কিন্তু এই দেহতাত্ত্বিক আলোচনায় রুচি ছিল না, সে সাগ্রহে তৃতীয় নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল—

মালিনী : তুমি চিনতে পেরেছ বুঝি ?

তৃতীয় নাগরিক উচ্চাঙ্গের একটু হাস্য করিলেন—

তৃতীয় নাগরিক : চেনা আর শক্ত কি ? একনজর দেখেই চিনেছি। মাথার শিরস্ত্রাণটা দেখলে না !

মালিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিরস্ত্রাণটা নতুন ধরণের—রোদ্দুরে ঝক্‌মক্ করে উঠল—

তৃতীয় নাগরিক : (গম্ভীরভাবে) আর্য্যাবর্ত্তের দাক্ষিণাত্যের

তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া লোকটি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—

ব্যক্তি : নারীজাতি রসাতলে যাক। আমার ঘোড়া কোথায় ?

মূক হাব্‌শীদ্বয় উত্তর দিল না, প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় একটি অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এক অশ্বপাল তোরণ-মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বপৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অশ্বপাল মুচ্‌কি হাসিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, যাইবার সময় হাব্‌শীদের দিকে একবার চোখ টিপিয়া গেল।

বোধ করি অশ্বের ক্ষুরশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি প্রবীণ ব্যক্তি তোরণ-স্তম্ভের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ক্ষৌরিত মস্তকে একটি সুপুষ্ট শিখা আছে, কর্ণে হংসপুচ্ছের লেখনী, হস্তে একটি মোটা দপ্তর। ইনি রাজ্যের পুস্তপাল।

পুস্তপাল মহাশয় বিলীয়মান অশ্বারোহীর দিকে একবার দৃক্‌পাত করিলেন, নিরুৎসুক কণ্ঠে হাব্‌শীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

পুস্তপাল : বিদর্ভ রাজকুমার চলে গেলেন ?

বিশদ হাস্যে হাব্‌শীদ্বয়ের সুকৃষ্ণ বদন মণ্ডল দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা যুগপৎ মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। পুস্তপাল মহাশয় গম্ভীরভাবে কর্ণ হইতে লেখনী লইয়া দপ্তরে লিখিতে লিখিতে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন—

পুস্তপাল . বিদর্ভ-কুমার। ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যা—

কালিদাস

উজ্জয়িনী

একটি বৃহৎ সভাগৃহ ; এত বৃহৎ যে পাঁচশত লোক অনায়াসে তাহাতে বসিতে পারে। গোলাকৃতি কক্ষ ; প্রাচীর সাধারণ কক্ষের চতুর্গুণ উচ্চ। প্রাচীরের নিম্নভাগে নানাবিধ পৌরাণিক ঘটনার চিত্র সারি সারি অঙ্কিত রহিয়াছে ; ঊর্দ্ধে প্রায় ছাদের নিকটে আলিসার মত প্রশস্ত ব্যাল্‌কনি প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া আছে। তাহার উপর শূলধারী দুইজন হাব্‌শী রক্ষী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা এক বিচিত্র অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিতেছে : স্কন্ধ হইতে শূল নামাইয়া পরস্পর যেন আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে ; তারপর যেন উভয়ে উভয়কে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া শূল স্কন্ধে তুলিয়া আবার বিপরীত মুখে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিতেছে। এই অভিনয় বস্তুত অহিংস হইলেও দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর।

সভাগৃহের নিম্নে মণিকুট্টিমের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ চক্রাকার বেদী, ভূমি হইতে মাত্র এক ধাপ উচ্চ। মূলত ইহা রাজসভায় সিংহাসন রক্ষার জন্য পট্টবেদিকা ; কিন্তু রাজসভা স্বয়ংবর সভায় রূপান্তরিত হওয়ায় সিংহাসন অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বেদীর সম্মুখে অল্প দূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আর একটি ক্ষুদ্র বেদিকা —ইহা রাজার সহিত ভাষণপ্রার্থী মান্য অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট। উপস্থিত এই বেদিকাটি শূন্য।

কিন্তু প্রধান পট্টবেদীকাটি শূন্য নহে, বরঞ্চ কিছু অধিক পরিমাণেই পূর্ণ। প্রায় পঁচিশ- ত্রিশটি সুন্দরী সুবেশা তরুণী এই বেদীর উপর, পদ্মের উপর প্রজাপতির মত ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বেদীর উপর স্থানে স্থানে স্বর্ণস্থালীতে মালা পুষ্প চন্দন শঙ্খ লাজ ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। তরুণীরা কলকণ্ঠে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে , কেহ বা বেদীর উপর অর্দ্ধশয়ান হইয়া অলস অঙ্গুলি সঞ্চালনে বীণার তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতেছে।

কালিদাস

বেদীর উপর একটি দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে দুইটি শুক পক্ষী চরণে শৃঙ্খল পরিয়া বসিয়া আছে। একটি তরুণী মৃণাল বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহাদের ধান্যের শীষ্ খাওয়াইতেছেন। এই তরুণীর মুখাবয়ব পশ্চাৎ হইতে দেখা না গেলেও তাঁহার গ্রীবা ও দেহের মর্য্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিমা হইতে অনুমান হয় যে ইনিই রাজকন্যা।

আর একটি যুবতী বেদীর কিনারায় বসিয়া গভীর মনঃসংযোগে কজ্জলমসী দিয়া ভূমির উপর আঁক কষিতেছে। অন্য কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; মুখে উদ্বেগ ও শঙ্কা পরিস্ফুট। অবশেষে অঙ্ক শেষ করিয়া যুবতী হতাশাব্যঞ্জক মুখ তুলিল, হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

যুবতী: উনপঞ্চাশ!

যুবতীর কণ্ঠস্বরে রাজকুমারী পক্ষীদণ্ডের দিক হইতে ফিরিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মুখ দেখা গেল। এতগুলি সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা রূপসীর মধ্যে তিনিই যে প্রধানা, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। অভিমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈদগ্ধ্য ও সৌকুমার্য্য মিশিয়া মুখে অপূর্ব্ব লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

প্রিয়সখী চতুরিকার হতাশ মুখভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারীও একটু বিষণ্ণ হাস্য করিলেন, তারপর অলসপদে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমারী: চতুরিকা, ঠিক জানিস উনপঞ্চাশটা? আমার তো মনে হচ্চে, একশ' উনপঞ্চাশ—

চতুরিকা আবার হিসাবের দিকে দৃষ্টি নামাইল, মনে মনে হিসাব পরীক্ষা করিল, তারপর বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

চতুরিকা : উহুঁ, উনপঞ্চাশ। এই যে হিসেব—তের জন রাজকুমার, সতেরোটি সামন্ত, চৌদ্দজন শ্রেষ্ঠীপুত্র, আর পাঁচটি নাগরিক। কত হল ?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সখী চতুরিকার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ;
একজন চট্ করিয়া জবাব দিল—

প্রথমা : সাতচল্লিশ !

দ্বিতীয়া : দূর মুখপুড়ি, তিপান্ন !

রাজকুমারী হাসিলেন—

রাজকুমারী : তোরা সবাই অঙ্কশাস্ত্রে বররুচি !

চতুরিকা সকৌতুক ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজকুমারীর পানে চোখ তুলিল—

চতুরিকা : শুধু তোমার বুঝি বরে রুচি নেই !

সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজকুমারীও হাসিতে হাসিতে চতুরিকার পাশে
উপবেশন করিলেন। আর সকলে তাঁহাদের ঘিরিয়া বসিল।
রাজকন্যা মুখের একটি কৌতুক-করুণ ভঙ্গী
করিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী : রুচি থেকেই বা লাভ কি চতুরিকা ? উনপঞ্চাশ জনের একজনও তো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না—

কালিদাস

চতুরিকা রাজকুমারীর সবচেয়ে প্রিয় সখী, তাঁহার মনের অনেক খবর জানে। সে মিটিমিটি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—

চতুরিকা : আচ্ছা সত্যি বল পিয়সখি, এদের মধ্যে কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তুমি খুশী হতে?

রাজকুমারীও হাসিলেন—

রাজকুমারী : যদি বলি হতুম!

চতুরিকা মাথা নাড়িল—

চতুরিকা : তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি না, ওদের মধ্যে একজনকেও তোমার মনে ধরেনি।

সখীদের মধ্যে একজন তরল কৌতুকচপলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

প্রথমা : শুধু রামছাগলটিকে ছাড়া!

হাসির লহর উঠিল। একটি হতভাগ্য পাণিপ্রার্থীর ছাগ-সদৃশ চেহারা লইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক রসিকতা হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারী একমুঠি ফুল ছুঁড়িয়া রহস্যকারিণীকে প্রহার করিলেন।

রাজকুমারী : রামছাগলটিকে মৃগশিরার ভারি মনে ধরেছে, ঘুরে ফিরে কেবল তারই কথা! তোর জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখব না কি? এখনও হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে।

মৃগশিরা রাজকুমারীর নিক্ষিপ্ত ফুলগুলি কবরীতে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—

মৃগশিরা : তা মন্দ কি ! আমি গররাজি নই—

আর একজন ফোড়ন কাটিল

দ্বিতীয়া : বাজযোটক হবে—মৃগশিরা আর রামছাগল—

চতুরিকা একটু গম্ভীর হইল

চতুরিকা : ঠাট্টা নয়, ভারি আশ্চর্য্য কথা। এতগুলো বড় বড় লোক, একটা প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারলে না !

তৃতীয়া : যা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন !

রাজকুমারী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী : প্রশ্ন বিদ্‌ঘুটে নয় মালবিকা, লোকগুলো বিদ্‌ঘুটে। ওদের যদি সহজবুদ্ধি থাকত তা হ'লে সহজেই উত্তর দিতে পারত।

একটি সখীর কৌতূহল দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সে রাজকুমারীর কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া আব্‌দারের সুরে বলিল—

চতুর্থী : বল না পিয়সহি, প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি ?

আর একজন তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—

পঞ্চমা : না না, আমরা সবাই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই— পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট কি ?

রাজকুমারী অন্য একটি সখীর পৃষ্ঠে নিজ পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন, একটু অলস হাসিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী : তোরাই বল্ না দেখি।

সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। একটি সরলা যুবতী উৎসাহভরে বলিল—

শিখরিণী : আমি বলব? আনারস। (ঝোল টানিয়া) আনারসের চেয়ে মিষ্টি পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই।

মৃগশিরা মুখ তুলিল—

মৃগশিরা : আমি বুঝেছি—আক! ইক্ষুদণ্ড! আকের চেয়ে মিষ্টি আর কি আছে? আক থেকেই তো যত সব মিষ্টি জিনিষ তৈরি হয়।

তৃতীয়া আপত্তি তুলিল—

তৃতীয়া : তা হ'লে মধু হবে না কেন? মধুই বা কি দোষ করেছে। হ্যাঁ পিয়সহি, মধু—না?

রাজকুমারী হাসিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারী : দূর হ' পেটুকের দল! কিন্তু আর তো পারা যায় না। মাথার ওপর উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য হয়ে গেল; আর কি সহ্য হবে!

রাজকুমারী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চতুরিকার পানে তাকাইলেন। বিদ্যুল্লতা সান্ত্বনার সুরে বলিল—

বিদ্যুল্লতা : এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন !—এখনও সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে !

রাজকুমারী অধীরভাবে মাথা নাড়িলেন—

রাজকুমারী। তা নয় বিদ্যুল্লতা। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের এত অধঃপতন হয়েছে ! এক অশিক্ষিতা মেয়ের তিনটে সামান্য প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারছে না !

চতুরিকা মুখভঙ্গী করিল—

চতুরিকা : তুমি অশিক্ষিতা মেয়ে ! বাব্বাঃ !—চতুঃষষ্ঠিকলা শেষ করে বসে আছ !

বনজ্যোৎস্না রাজকুমারীকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিল—

বনজ্যোৎস্না : হতাশ হয়ো না পিয়সহি, এখনও অনেক আস্‌বে , কেউ না কেউ ঠিক উত্তর দিয়ে ফেলবেই—

রাজকুমারী : উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়—যাঁরা আসবেন তাঁরা সবাই ঐ রামছাগলের ভায়রা ভাই। তার চেয়ে যদি আমার শুকসারীকে প্রশ্ন করতুম, ওরা ঠিক উত্তর দিতে পারত।

চতুরিকা : তবে তাই কর, সব হাঙ্গাম চুকে যাক। ঘরের

মেয়ে ঘরেই থাকবে, শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। তা হ'লে মহারাজকে তাই বলি গিয়ে? কি বল?

রাজকুমারী একটু মৃদু হাসিলেন।

কাট্।

তোরণ ও প্রতীহার ভূমি। কৃপাণধারী হাব্শীদ্বয় পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়াছিল, সহসা সম্মুখে চাহিয়া তাহারা আরও সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল।

যাহাকে দেখিয়া হাব্শীদ্বয় সতর্ক হইয়াছিল, সে আর কেহ নহে, আমাদের অশ্বারূঢ় কালিদাস। নগরের বহু স্থান ঘুরিয়া উন্মত্ত ঘোটক অবশেষে রাজপ্রাসাদের দিকে উল্কার বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কালিদাস ঘোড়ার কেশর ধরিয়া কোন মতে টিঁকিয়া আছেন।

ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাব্শীদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হাব্শীরাও তৈয়ার ছিল, ডালকুত্তার মত লম্ফ দিয়া পড়িয়া দুই দিক হইতে ঘোড়ার বল্গা চাপিয়া ধরিল। হাব্শীদের দেহে অসুরের শক্তি, ঘোড়া আর অধিক আস্ফালন করিতে পারিল না, শান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস এই সুযোগই খুঁজিতেছিলেন, পিছ্লাইয়া ঘোড়ার ঘর্ম্মাক্ত পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘকাল একটা উদ্দাম অসংযত ঘোড়ার পিঠে মরি-বাঁচি ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার পর কালিদাসের মানসিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তিনি কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অশ্বপাল আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গিয়াছিল; পুস্তপাল মহাশয়ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কালিদাসকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—

পুস্তপাল : আসুন, আসুন কুমার—

কলিদাস থতমত খাইয়া গেলেন।

কালিদাস : আমি—আমি—

পুস্তপাল : পরিচয় দিতে হবে না সৌরাষ্ট্রকুমার—আপনার শিরস্ত্রাণ কে না চেনে?—আসতে আজ্ঞা হোক—এইদিকে—মহামন্ত্রী প্রতীক্ষা করছেন—

পুস্তপাল আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দুই হস্ত ভিতরের দিকে প্রসারিত করিলেন। ভ্যাবাচাকা অবস্থায় কালিদাস পুস্তপাল মহাশয়ের সঙ্গে রাজতোরণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুরীর প্রথম মহলে মহামন্ত্রী যুক্তকরে কালিদাসকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।
শীর্ণকায় তীক্ষ্ণচক্ষু একটি বৃদ্ধ, তিনি মহা আড়ম্বর
সহকারে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন—

মহামন্ত্রী : স্বাগতম্—শুভাগতম্! অষ্টোত্তর শ্রীযুক্ত পরম-ভট্টারক পরম-ভাগবত সৌরাষ্ট্রকুমারের জয় হোক।

অভিভূত কালিদাস ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিতে লাগিলেন;
মহামন্ত্রী বলিয়া চলিলেন—

মহামন্ত্রী : আসুন মহাভাগ—আপনার পদদ্বন্দ্ব স্পর্শে—

কালিদাস এতক্ষণে কেবল 'পদ' শব্দটি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু 'পদদ্বন্দ্ব' কি বস্তু? কালিদাস ত্রান্তভাবে নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টি নামাইলেন—

কালিদাস : পদদ্বন্দ্ব ?

মহামন্ত্রী : (স্মিতমুখে) পদযুগল—

কালিদাস তথাপি বিভ্রান্ত—

কালিদাস : পদযুগল ?

মহামন্ত্রী সপ্রশংস মুখে একটু হাস্য করিলেন—

মহামন্ত্রী : কুমার দেখছি পরিহাসপ্রিয়। পদদ্বন্দ্ব অর্থাৎ পদ-যুগল— অর্থাৎ দুটি পা—!

কালিদাসের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল—

কালিদাস : ওঃ! দ্বন্দ্ব মানে দুটি! তাই বুঝি পদদ্বন্দ্ব বলছেন—?

মহামন্ত্রী আসিয়া কালিদাসের বাহু ধরিলেন। রসিক ও কৌতুকী রাজপুত্র এ জগতে বড়ই বিরল। বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন—

মহামন্ত্রী : বৃদ্ধের সঙ্গে পরিহাস করবেন না কুমার, রসালাপের যোগ্যতর স্থান কাছেই আছে। আসুন, আপনাকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাই—

কাট্‌।

ওদিকে রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সভায় বহুক্ষণ কোনও পাণিপ্রার্থীর শুভাগমন হয নাই ; এই অবকাশে সখীদের মধ্যে রঙ্গরস জমিয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারী পূর্ব্ববৎ একটি সখীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া অলস ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, বিদ্যুল্লতা একটি সুদীর্ঘ ময়ূরপুচ্ছ হাতে লইয়া বেত্রের মত লীলায়িত করিতেছে ও রাজ-কুমারীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার গানের কথাগুলিতে যে মৃদু ব্যঙ্গ-রস রহিয়াছে, রাজকুমারী তাহা উপভোগ করিতেছেন। সখীরাও কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, কেহ বা ব্যক্ত-ভাবেই কুন্দ-দন্ত বিকশিত করিয়া আছে। একটি সখীর অলস অঙ্গুলি আঘাতে ভূমিশয়ান বীণার তন্ত্রী হইতে মুগ্ধ মূর্চ্ছ‌না গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

লাস্যের চটুল ছন্দে বিদ্যুল্লতা গাহিতেছে—

"আমি হব গুরুমশাই আমার নাগর হবে চেলা
বেত উঁচিয়ে বস্‌ব আমি সন্ধ্যে-সকাল বেলা—"

চতুরিকা মিটি-মিটি কণ্ঠে গান গাহিয়া প্রশ্ন করিল—

"আর রাত্তিরেতে সই—?"

বিদ্যুল্লতা ভ্রূবিলাস করিয়া বাঁকা হাসিয়া গাহিল—

"তখন থাক্‌বে না ক' পাততাড়ি সই থাকবে না ক' বই।"

বনজ্যোৎস্না ভাষ্য করিয়া যোগ করিল—

"শুধু হৃদয় জুড়ে প্রেমের লহর করবে লো থৈ থৈ।"

কালিদাস

বিদ্যুল্লতার লাস্যবিলাস আরও দ্রুতচঞ্চল ও মদোন্মত্ত হইয়া উঠিল; চৈতাল ঘূর্ণীর মত মহা উল্লাসে রাজকুমারীর চারি পাশে আবর্ত্তন করিতে করিতে সে গাহিল—

"দুটি গুরু-চেলায় মনের মিলে খেলব প্রেমের খেলা।"

সহসা বাধা পড়িল। কয়েকটি সখী দূরে মহামন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বিদ্যুল্লতার দিকে উৎকণ্ঠ হইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—স্ স্ স্—! স্ স্ স্!

বিদ্যুল্লতা ঘাড় ফিরাইয়া একবার দ্বারের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিয়াই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। রাজকুমারী ঈষৎ চকিতভাবে দ্বারের দিকে আরক্ত চক্ষু ফিরাইলেন।

প্রধান দ্বার দিয়া মহামন্ত্রী কালিদাসকে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। কালিদাসের চোখে মুখে অকুণ্ঠ বিস্ময়, মাঝে মাঝে কোনও একটি সুন্দর কারুকার্য্য দেখিয়া তাঁহার মন্থর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে; মহামন্ত্রী তাঁহার বাহু স্পর্শ করিয়া আবার তাঁহাকে সম্মুখে পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমে উভয়ে দ্বিতীয় বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালিদাস সম্মুখস্থ যুবতীযূথের প্রতি স্তম্ভিত বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

সখীরাও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সহস্রচক্ষু হইয়া এই শিরস্ত্রাণধারী পরম সুন্দর যুবাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। রাজকুমারী একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাঁহার মুখের নিরুৎসুক ঔদাসীন্য যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এমন কান্তিমান পাণিপ্রার্থী ইতিপূর্ব্বে স্বয়ংবর সভায় পদার্পণ করেন নাই।

মহামন্ত্রী মহাশয় একবার গলা-ঝাড়া দিয়া দক্ষিণ হস্তখানি অভয়মুদ্রার ভঙ্গীতে তুলিলেন।

মহামন্ত্রী : স্বস্তি।—পরম ভট্টারক শ্রীমান সৌরাষ্ট্রকুমার রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছেন। শুভমস্তু।

রাজকুমারী দুই করতল যুক্ত করিয়া প্রণাম করিলেন; চোখ দুটি ঈষৎ উঠিয়া আবার নত হইল। বাহিরে কিছু প্রকাশ না পাইলেও তিনি যেন অন্তরে অন্তরে একটু চঞ্চল হইযা উঠিয়াছেন, জোয়ারের জলস্পর্শে ঘাটে-বাঁধা তরণীর মত।

এদিকে মহামন্ত্রী কালিদাসকে চক্ষু-দ্বারা ইসারা করিতেছেন মাথা হইতে শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিতে; কিন্তু কালিদাস ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রী তখন তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিলেন; কালিদাস তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ওটা রাখিবেন কোথায়? এদিক ওদিক স্থান না দেখিয়া শেষে মহামন্ত্রীর হাতে উহা ধরাইয়া দিয়া সহাস্য মুখে রাজকুমারীর দিকে ফিরিলেন।

কালিদাসের শিরস্ত্রাণ-মুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যুবতীদের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল, তাহারা নিঃশ্বাস সম্বরণ করিয়া দেখিতে লাগিল; এক ঝাঁক চঞ্চল খঞ্জন যেন কোন্ মায়াবীর মন্ত্রকুহকে স্থির চলৎশক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। শেষে মৃগশিরা আর থাকিতে না পারিয়া পাশের সখীর কানে কানে বলিল—

মৃগশিরা : কী চমৎকার চেহারা ভাই, রাজকুমারের! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প!—এমন আর কখনো দেখেছিস্?

আশেপাশের দুই-তিন জন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—স্‌স্‌—।

কালিদাস

চতুরিকা রাজকুমারীর মনের ভাব বুঝিয়াছিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

চতুরিকা : মহেশ্বরেব কাছে মানত কর, এবার যেন না ফস্কায—

রাজকুমারী একটু মুখ টিপিয়া হাসিযা তাহাকে পাশে সরাইয়া দিলেন। চতুরিকা বড় প্রগল্‌ভা।

প্রশ্ন করিতে বিলম্ব হইতেছে, সৌরাষ্ট্রকুমারকে কতক্ষণ দাঁড করাইয়া রাখা যায়? মহামন্ত্রী আর একবার গলা-ঝাড়া দিযা বলিলেন—

মহামন্ত্রী : রাজকুমারী, কুমার-ভট্টারক নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, আপনার প্রশ্ন করুন।

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন। কালিদাসের সহিত তিনি ঠিক মুখোমুখি-ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন না, একটু পাশ ফিরিয়া ছিলেন। এখন মনোরম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে তিনি একবার কালিদাসের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তারপর আবার সম্মুখ দিকে চাহিযা অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী : প্রথম প্রশ্ন হচ্চে—জগতে সব চেয়ে শক্তিমান কী?

সখীরা এতক্ষণ একদৃষ্টে রাজকুমারীর পানে চাহিয়াছিল, এখন যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিতবৎ একসঙ্গে কালিদাসের পানেও মুণ্ড ফিরাইল।

কালিদাস কিন্তু ইত্যবসরে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন; চারিদিকে এত মহার্ঘ বৈচিত্র্য ছড়ানো রহিয়াছে যে, চক্ষু বিভ্রান্ত হইলে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি

কুমারীর প্রশ্ন করার ব্যাপারটা ভালরূপ অনুধাবন করিয়াছিলেন কি-না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। মহামন্ত্রী তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন ইহা সৌরাষ্ট্রদেশীয় রসিকতার একটা অঙ্গ। তিনি সসম্ভ্রমে প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া কালিদাসের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—

মহামন্ত্রী : কুমারীর প্রশ্ন হচ্চে, জগতে সব চেয়ে শক্তিমান কী ?

কালিদাসের চক্ষুযুগল এই সময় বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাবে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, হঠাৎ তাঁহার মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। ত্রাসবিস্ফারিত নেত্র উর্দ্ধে রাখিয়াই তিনি একটি বাহু পাশে বাড়াইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহাকে দুই হস্তে জাপ্টাইয়া ধরিয়া আলিসার পানে তাকাইতে লাগিলেন।

উর্দ্ধে আলিসার উপর যে হাব্শী রক্ষীযুগলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়াই যে কালিদাসের ঈদৃশ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী উত্যক্ত হইয়া ভাবিলেন, সৌরাষ্ট্রদেশের রাজকীয় রসিকতা ক্রমশ চরমে উঠিতেছে। গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি বলিলেন—

মহামন্ত্রী :—প্রশ্নের উত্তর দিন কুমার !—

ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পাইল না, হাব্শীযুগল ইত্যবসরে দ্বন্দ্বাভিনয় শেষ করিয়া আবার শান্তভাবে বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালিদাস কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মহামন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিলেন। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী কণ্ঠের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে পুনশ্চ বলিলেন—

মহামন্ত্রী : এইবার প্রশ্নের উত্তর, কুমার—।

কিন্তু কালিদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বেই রাজকুমারী কথা কহিলেন; বীণার ঝঙ্কারের মত ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন--

রাজকুমারী : প্রথম প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেয়েছি।

সকলে অবাক। উত্তেজিত সখীর দল রাজকুমারীকে জাল করিয়া ঘিরিয়া ধরিল। চতুরিকা বলিয়া উঠিল—

চতুরিকা : অ্যাঁ—কী উত্তর পেলে ?

কুমারীর গাল দুটি একটু অরুণাভ হইল। তিনি ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী : প্রশ্নের উত্তর হচ্চে—ভয়। কুমার অভিনয় দ্বারা যথার্থ উত্তর দিয়াছেন।

সখীগণ সশব্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া কালিদাসের দিকে ফিরিল।

কালিদাস মহামন্ত্রীর পানে চাহিয়া ঈষৎ বিহ্বলভাবে হাসিতেছেন, কোন্ দিক দিয়া কি হইয়া গেল, যেন ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রীও কতকটা বোকা বনিয়া গিয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন।

রাজকুমারী কথা কহিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে একটু উদ্বেগ দেখা দিয়াছে; কি জানি কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিবেন কি না! কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর তেমনি সংযত ও আবেগহীন রহিল।

রাজকুমারী : এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে ?

প্রশ্ন করিয়াই রাজকুমারী কালিদাসের দিকে একটি উৎকণ্ঠা-মিশ্র দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন।

কালিদাস

কালিদাস এবার প্রস্তুত ছিলেন ; প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মহামন্ত্রীর প্রতি কৌতুক-কটাক্ষ পাত করিয়া তর্জ্জনী তুলিলেন, যেন মহামন্ত্রীকে ইঙ্গিতে বলিতে চাহিলেন যে, এ প্রশ্নের সমাধান তো পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। তার পর বিজয়দীপ্ত চক্ষে রাজকুমারীর দিকে ফিরিয়া দুইটি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন–

কালিদাস : দ্বন্দ্ব—দুই !

সখীরা একাগ্র দৃষ্টিতে কালিদাসের দিকে চাহিয়াছিল, এখন যন্ত্র-চালিতবৎ রাজকুমারীর পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

রাজকুমারীর চোখে চকিত আনন্দ খেলিয়া গেল, তিনি রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিলেন। চতুরিকা উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

চতুরিকা : কি হ'ল—ঠিক হয়েছে ?

রাজকুমারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বোধ করি নিজের উদ্দাম হৃদয়বৃত্তি সম্বরণ করিয়া লইলেন, তারপর ধীরস্বরে কহিলেন—

রাজকুমারী : কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন—দ্বন্দ্ব হয় দুয়ের মধ্যে।

সভাকক্ষের ভিতর দিয়া একটা উত্তেজনার ঝড় বহিয়া গেল। সখিরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে কলকূজন করিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ 'স্স্স্—' শব্দের শাসনে নীরব হইল। উত্তেজনায় মৃগশিরা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, বনজ্যোৎস্না ভূলুণ্ঠিত বীণাটার উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাহার মর্ম্মতন্ত্র হইতে

যন্ত্রণার কাকুতি বাহির করিল ; বিদ্যুল্লতার নীবিবন্ধ খুলিয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ সেইদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সে ব্যাকুলভাবে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া সকলের পিছনে লুকাইল। রাজকুমারী সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীহারশুভ্র উর্ণাটি ভাল করিয়া নিজ দেহে জড়াইয়া লইলেন।

বুড়া মহামন্ত্রীর গায়েও বোধ হয় উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিলেন —

মহামন্ত্রী : ধন্য কুমার ! ধন্য কুমার ! আপনি দুটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন ! এবার শেষ প্রশ্ন ! মাত্র একটি প্রশ্ন বাকি—

এই সব উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে কালিদাস কিন্তু অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে একদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে শুক-সারী পক্ষী দুটি তাঁহার সকৌতুক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই রাজকুমারী যখন তৃতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিলেন তখন তাহা কালিদাসের কানে গেল কি-না সন্দেহ।

যিনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাঁহার কোনও উৎকণ্ঠাই নাই, কিন্তু রাজকুমারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল না। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না। কুমার যদি শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন অথচ রাজকুমারীর মনের পক্ষপাত প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে বড় লজ্জার কথা হইবে। কুমারী যথাসম্ভব স্থিরকণ্ঠে কথা বলিলেন, তবু গলা একটু কাঁপিয়া গেল

রাজকুমারী : শেষ প্রশ্ন -- পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট কি ?

যুবতীবৃন্দ যুগপৎ কালিদাসের পানে চক্ষু ফিরাইল.

কালিদাস ফিক্ করিয়া হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কথা নাই, চক্ষু সারী-শুকের উপর নিবদ্ধ। রাজকুমারী ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন —কালিদাস অন্যদিকে তাকাইয়া আছেন ; তাঁহার মুখে ক্ষণিক ক্ষোভের ছায়া পড়িল। পরক্ষণেই কালিদাস সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাস : দ্যাখো দ্যাখো—ঐ দ্যাখো—!

সকলেই একসঙ্গে তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া তাকাইলেন। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয় ; দণ্ডের উপর বসিযা সারী-শুক অর্দ্ধমুদিত চক্ষে পরস্পর চঞ্চু-চুম্বন করিতেছে ; তাহাদের কণ্ঠ হইতে গদগদ মৃদু কূজন নির্গত হইতেছে। যিনি ভবিষ্যকালে লিখিবেন—'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াম্ স্বামনুবর্ত্তমানঃ—' তিনি এই দেখিয়াই বিহ্বল আত্মবিস্মৃত।

রাজকুমারীর চক্ষে কিন্তু আনন্দের বিজলী খেলিয়া গেল। তিনি কালিদাসের পানে সভ্রূভঙ্গ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সলজ্জ রক্তিম মুখখানি নত করিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস হাসিতে হাসিতে রাজকুমারীর দিকে ফিরিতেছিলেন, চমকিত হইয়া দেখিলেন, রাজকুমারী ধীরে ধীরে নতজানু হইতেছেন। যুক্তকরে শির অবনমিত করিয়া কুমারী অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী : আর্য্যপুত্র শেষ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন ; পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট—প্রণয়।

ক্ষণকালের বিস্ময় বিমূঢ়তা কাটিয়া যেন শর্তভঙ্গ হইয়া গেল। সখীরা আর সম্ভ্রম শালীনতার শাসন মানিল না, চীৎকার হুড়াহুড়ি অঞ্চল-উত্তরীয় উৎক্ষেপে তাহাদের প্রমত্ত জয়োল্লাস একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।

রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইতেই চার-পাঁচজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিল। কয়েকজন মুঠি মুঠি লাজ লইয়া সকলের মাথার উপর বৃষ্টি করিতে লাগিল। একজন ঘন ঘন শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর হাত ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল, অন্য কয়জন পরস্পর আঁচল ধরিয়া টানিয়া, কবরী খুলিয়া দিয়া কপট-কলহে হৃদয়াবেগ লাঘব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহামন্ত্রী কালিদাসের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—

মহামন্ত্রী: ধন্য কুমার! ধন্য আপনার কূট-বুদ্ধি!—আমি মহারাজকে সংবাদ দিতে চললাম।

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বিস্রস্তকুন্তলা চতুরিকা বেদীর কিনারায় ঊর্ধ্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত নাড়িয়া উপরিস্থিত একজন হাব্‌শী রক্ষীকে ইসারা করিতেছিল, মুখের সম্মুখে সম্পুটিত করপল্লব যুক্ত করিয়া জানাইতেছিল—শিঙ্গা বাজাও, বিষাণ বাজাও —নগরীকে সংবাদ দাও রাজকুমারী পতি-বরণ করিয়াছেন।

হাব্‌শী হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া ঘন ঘন ঘাড় নাড়িল, তারপর ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

সভাগৃহের বহিঃপ্রাচীরে বহু ঊর্ধ্বে একটি অলিন্দযুক্ত গবাক্ষ। গবাক্ষে হাব্‌শী-রক্ষীকে দেখা গেল। সে তূর্য্য মুখে তুলিয়া মন্দ্র-রবে শুভবার্তা ঘোষণা করিল।

কাট্।

রাজভবনের তোরণ-শীর্ষে মন্দিরাকৃতি ঘটিকাগৃহ, ইহা রাজ্যের প্রধান মান-মন্দির। ঘটিকাগৃহের এক বাতায়নে দাঁড়াইয়া একজন প্রহরী উৎকর্ণভাবে দূরাগত তূর্য্য-ধ্বনি শুনিতেছে।

তূর্য্য-ধ্বনি নীরব হইলে প্রহরী একটি বাঁকা বিষাণ মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। বিষাণ হইতে যে শব্দ-তরঙ্গ নিঃসৃত হইল তাহা তূর্য্য-ধ্বনি অপেক্ষা গভীরতর ও দূর-ব্যাপক।

কাট্।

নগর মধ্যে একটি উচ্চ জয়স্তম্ভ। স্তম্ভ চূড়ায় চারিজন বংশীবাদক চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া বংশীতে ফুৎকার দিতেছে, দিকে দিকে আনন্দবার্ত্তা বিঘোষিত হইতেছে।

স্তম্ভমূলে মদনোৎসব-প্রমত্ত নাগরিক-নাগরিকা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে ও বাহু আস্ফালন করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে।

কাট্।

সভাগৃহে সখীদের প্রমোদবিহ্বলতা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েকটি প্রগল্‌ভা সখী ছুটিয়া গিয়া কালিদাসের দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া রাজকুমারীর পাশে দাঁড় করাইয়া দিল; তারপর সকলে মিলিয়া সনৃত্য ভঙ্গীতে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতে আরম্ভ করিল—

"ফাগুনের পূর্ণিমাতে
এ কি চাঁদের মেলা
নয়নের পিচ্‌কারিতে
সখি রঙের খেলা।—"

কাট্।

নগরোদ্যানের দৃশ্য। চারিদিকে নানা জাতীয় উৎসব চলিয়াছে। একজন বাজীকর দীর্ঘ বংশদণ্ডের শিখরে উঠিয়া চক্রবৎ ঘুরপাক খাইতেছে। অন্যত্র দুইজন অসি-যোদ্ধা অসিক্রীড়ার বিচিত্র কৌশল দেখাইয়া চমৎকৃত নাগরিকদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। মদন-মন্দির ঘিরিয়া একদল তরুণী নাগরিকা গরবা নৃত্য করিতেছে, তাহাদের কটি-ধৃত ধাতু-কলসের উপর অঙ্গুরীয়ের সমকালীন আঘাত নৃত্যের তাল রক্ষা করিতেছে—

"অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগাও অনঙ্গ
বুকের মাঝে বহাও সুখ-তরঙ্গ—"

কাট্

নগরোদ্যানবেষ্টনকারী পথের উপর দিয়া এক সুসজ্জিত হস্তী চলিয়াছে, চারিদিকে বিপুল জনতা। হস্তী-পৃষ্ঠে আসীন ঘোষক চীৎকার করিয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বোধ করি রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সংক্রান্ত কোনও রাজকীয় বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু জনতার বিপুল আরাবে কিছুই শুনা যাইতেছে না। ঘোষকের পশ্চাতে বসিয়া দ্বিতীয় এক পুরুষ মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চারিদিকে ছড়াইতেছে। নিম্নে সোনা কুড়াইবার হুড়াহুড়ি মারামারি।

।

রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে দীপান্বিতা নগরী। সৌধে সৌধে দীপমালা, গীতবাদ্যে, সুগন্ধি অগুরু ধূমে বাতাস আমোদিত।

কালিদাস

সর্ব্বাঙ্গে দীপালঙ্কার পরিয়া রাজপুরী সখিপরিবৃতা প্রধানা নায়িকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাত্রি যত গভীর হইতেছে উৎসবের চাঞ্চল্য ততই মন্থর রসঘন হইয়া আসিতেছে; নায়ক-নায়িকার নিভৃত মিলনের আর বিলম্ব নাই।

নগরীর এক মদিরাগৃহের সম্মুখে একদল মশালহস্ত উৎসবকারী সৌরাষ্ট্রের প্রকৃত রাজকুমারকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল এবং প্রমত্ত রঙ্গ-কৌতুকের অঙ্কুশে বিঁধিয়া তাঁহাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সৌরাষ্ট্রকুমার দীর্ঘ বনপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র নগরে পৌঁছিয়াছেন, অঙ্গের বসন ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত, জঠরে জ্বলন্ত ক্ষুধা—তাঁহার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, কেহই তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না।

সৌরাষ্ট্রকুমার: (উত্তপ্ত কণ্ঠে) আমি বল্‌ছি আমিই সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার!

এক ব্যক্তি: (মুখে চটকার শব্দ করিয়া) তা তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছ—আমরাও শুনে আসছি, কিন্তু তার প্রমাণ কই বাছাধন?

রাজকুমার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, উদ্ধত স্বরে কহিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: প্রমাণ! প্রমাণ আবার কি?—দেখতে পাচ্ছ না আমি রাজকুমার?

বলিয়া তিনি বুক ফুলাইয়া গর্ব্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। সকলে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে একজন সান্ত্বনার সুরে বলিল—

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার। —কিন্তু যার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হ'ল, সে তবে কে ?

সৌরাষ্ট্রকুমার এবার একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন, ফেনায়িত মুখে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার : সে—সে একটা কাঠুরে। চোর—প্রতারক —বাট্‌পাড় ; আমার কাপড়-চোপড় ঘোড়া—সব চুরি ক'রে পালিয়েছে—

আবার উচ্চ হাস্যে তাঁহার কথা চাপা পড়িয়া গেল, রাজকুমার নিষ্ফল ক্রোধে দন্ত কিড়িমিড়ি করিতে লাগিলেন।—হাসি মন্দীভূত হইলে প্রথম ব্যক্তি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল—

এক ব্যক্তি : সত্যি কথা বলতে কি চাঁদবদন, তোমাদের মধ্যে কাঠুরে যদি কেউ থাকে তো সে তিনি নয়—তুমি ! বলি, ক'ঘড়া তালের রস চড়িয়েছ ?

সকলে হাসিল। রাজকুমার দেখিলেন এখানে কিছু হইবে না, তিনি রূঢ়হস্তে ভিড় সরাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন।

সৌরাষ্ট্রকুমার : ছেড়ে দাও—সরে যাও। আমি দেখে নেব সেই কাঠুরেটাকে—শূলে দেব ! কোথায় যাবে সে ?—একবার তাকে দেখতে চাই !

তাঁহার কণ্ঠস্বর জনতার বাহিরে মিলাইয়া গেল। প্রথম ব্যক্তি নীরস মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

এক ব্যক্তি : কী আর দেখবে যাদু ! তিনি এতক্ষণ রাজ-কুমারীকে নিয়ে বাসরশয্যায় শুয়েছেন।

আবার হাসির লহর ছুটিল।

ওয়াইপ্।

রাজ-ভবনভূমির মধ্যে একটি সরোবর। সরোবরের দর্পণে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

বাঁধানো ঘাটের পাশে মর্মর বেদী, তাহার উপর কালিদাস ও রাজকন্যা পাশাপাশি বসিয়া আছেন। নব পরিণয়ের পীত সূত্র তাঁহাদের মণিবন্ধে জড়ানো রহিয়াছে। রাজকন্যার হাতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য নির্ম্মিত তীর—যাহা পরবর্ত্তী কালে কাজল লতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজকুমারী নতমুখে বসিয়া তীরটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন; কালিদাস মুগ্ধ উন্মনা দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাঁদের পানে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ কোনও কথাবার্ত্তা নাই। তারপর কালিদাস একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

কালিদাস : কী সুন্দর চাঁদ। ঠিক যেন—ঠিক যেন—

যে উপমাটি খুঁজিতেছিলেন কালিদাস তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। রাজকুমারী মুখখানি একটু তুলিয়া স্মিত সলজ্জ মুখে বলিলেন—

রাজকুমারী : ঠিক যেন—?

কালিদাস ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িলেন—

কালিদাস : জানি না—মনে আসছে, মুখে আসছে না—

রাজকুমারী ঈষৎ নিরাশ হইলেন, নব অনুরাগের আকাঙ্ক্ষায় যে সুমিষ্ট উপমাটি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা কালিদাসের কণ্ঠে আসিল না।

এই সময় সহসা একটি বিকট শব্দ শুনিয়া রাজকুমারী চমকিয়া উঠিলেন।

শব্দটি আসিল প্রাসাদ বেষ্টনকারী প্রাচীরের পরপার হইতে। প্রাচীরের বাহিরে রাজপথ গিয়াছে, সেই পথ বাহিয়া এক শ্রেণী ভারবাহী উষ্ট্র চলিয়াছিল। একটি উষ্ট্র বোধ করি প্রাচীরের উপর হইতে গলা বাড়াইয়া অদূরে নবদম্পতীকে দেখিতে পাইয়া সহসা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল।

ভয় পাইয়া রাজকুমারী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কালিদাস ভারি কৌতুক অনুভব করিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর শিরীষ-কোমল হস্তে একটু সস্নেহ চাপ দিয়া বলিলেন—

কালিদাস : ভয় নেই রাজকুমারী; ও একটা উট—যাকে সাধু ভাষায় বলে—উট্র!

সাধুভাষা বলিয়া কালিদাস উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকুমারীর মুখে সংশয়ের ছায়া পড়ি[illegible] তিনি বিস্ফারিত নেত্রে কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী : কি—কি বললেন আর্য্যপুত্র?

কালিদাস

কালিদাস দেখিলেন ভুল হইয়াছে; তিনি তাড়াতাড়ি
ভুল সংশোধন করিলেন—

কালিদাস: না না—উট্র নয় উট্র নয়—উষ্ট্র!

রাজকুমারীর মুখ শুকাইয়া গেল; শঙ্কিত সন্দেহে কালিদাসের পানে চাহিয়া থাকিয়া তিনি আপনার অবশে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী:—উট্র—উষ্ট্র—!

তারপর চকিতে তাঁহার মুখের মেঘ কাটিয়া গেল, কালিদাস আজ প্রথম
হইতে যে আচরণ করিয়াছেন তাহা মনে পড়িয়া গেল।
তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাজকুমারী: ওঃ! আর্য্যপুত্র পরিহাস করছেন!—কী পরিহাস-প্রিয় আপনি!

কালিদাসও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় তোরণের ঘটিকাগৃহ হইতে মধ্য রাত্রির প্রহর বাজিল। ক্ষণস্থায়ী রাগিণীর আলাপ বন্ধ হইলে কালিদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—

কালিদাস: ও কি?

রাজকুমারীর চোখে আবার বিস্ময়-মিশ্র সন্দেহ দেখা দিল। রাজপুরীতে প্রহর বাজে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ তাহাও জানেন না? না, ইহাও পরিহাস?

রাজকুমারী : মধ্যরাত্রির প্রহর বাজল।

কালিদাস : ওহো—! বুঝেছি। রাত দুপুর হয়েছে।—এবার চল, ভেতরে যাই।

কালিদাস অকুণ্ঠ সহজতায় রাজকুমারীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। রাজকুমারীর সংশয় আবার দূর হইল। এমন স্বচ্ছন্দ আভিজাত্য, এমন অনিন্দ্য কান্তি, রাজপুত্র নহিলে কি সম্ভব?

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া শয়ন-ভবনের দিকে চলিলেন।

কাট্।

ঠিক এই সময় প্রাসাদের এক বহিঃকক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকারের অভিনয় চলিতেছিল। বক্রী পাপগ্রহের ন্যায় সৌরাষ্ট্রকুমার বক্রগতিতে কুন্তলরাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

দীপোৎসব তখনও শেষ হয় নাই, সেই দীপের আলোকে কক্ষের মধ্যস্থলে চারিটি ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিলেন—সৌরাষ্ট্রকুমার, মহামন্ত্রী, পুস্তপাল মহাশয় এবং কুন্তলরাজ। সৌরাষ্ট্রকুমারের বেশবাস পূর্ব্ববৎ, তিনি সংহত ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; মহামন্ত্রীর মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই; পুস্তপাল মহাশয় যে বিপন্ন ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। স্বয়ং কুন্তলরাজও যেন কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি দৃঢ়শরীর স্বল্পভাষী পুরুষ—বয়স অনুমান পঞ্চাশ, মাথার চুল ও গুম্ফ পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার চোখের স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি বর্ত্তমানে আকস্মিক বিপৎপাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তপাল মহাশয়ের প্রাণে ভয় ঢুকিয়াছে, হয় তো এই অনর্থের জন্য তাঁহাকেই দায়ী করা হইবে। তিনি করুণ স্বরে আপত্তি করিতেছেন—

পুস্তপাল : কিন্তু মহারাজ, এ যে—এ যে একেবারেই অসম্ভব ! এই লোকটা—অর্থাৎ ইনি—, এও কি সম্ভব !

প্রতিবাদে সৌরাষ্ট্রকুমার একটি অন্তর্গূঢ় গর্জ্জন ছাড়িলেন। ক্রমাগত চীৎকার করিয়া তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল.শরীরও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; তবু দক্ষিণহস্তের মুষ্টি পুস্তপালের নাসিকার অনতিদূরে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার : (দন্ত খিঁচাইযা) সম্ভব ! এই গ্যাখো সৌরাষ্ট্রের মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী।—সম্ভব।

পুস্তপাল মহাশয় মুষ্টির সান্নিধ্য হইতে নাসিকা দ্রুত অপসারিত করিয়া দেখিলেন, তর্জ্জনীতে সত্যই একটি মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী রহিয়াছে। তিনি বার দুই তিন চক্ষু মিটিমিটি করিলেন।

পুস্তপাল : কিন্তু—কিন্তু—আপনি যদি সত্যিই—, আপনার সহচর কই ?

সৌরাষ্ট্রকুমার : বলছি না, সহচরদের ফেলে আমি এগিয়ে আসছিলুম, তোমাদের জঙ্গলে এক বাট্‌পাড়—

কুন্তলরাজ বাধা দিয়া বলিলেন—

কুন্তলরাজ : দেখি অঙ্গুরীয় ; সৌরাষ্ট্রের মুদ্রা আমি চিনতে পারব।

সৌরাষ্ট্রকুমার অঙ্গুরীয় খুলিয়া রাজার হাতে দিলেন। দেখা গেল, তর্জ্জনীর মূলে নিত্য অঙ্গুরীয় পরিধানের চক্রচিহ্ন রহিয়াছে। এ ব্যক্তি যে অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া পাইয়া বা চুরি করিয়া পরিধান করিয়াছে তাহা নয়।

রাজা মুদ্রাটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া শেষে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন; অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

কুন্তলরাজ : হুঁ—মুদ্রা সৌরাষ্ট্রেরই বটে।—

সৌরাষ্ট্রকুমার অঙ্গুরীয় পুনশ্চ পরিধান করিতে করিতে চারিদিকে বিজয়দীপ্ত চক্ষু ঘুরাইতে লাগিলেন। পুস্তপাল মহাশয়ের মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল।

মহামন্ত্রী মৃদু গলা-ঝাড়া দিলেন।

মহামন্ত্রী : ইনি যদি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজই হন —তা হলেও তো এখন আর—

কুন্তলরাজ : কোনও উপায় নেই।—সে-ব্যক্তি যে-ই হোক, অগ্নি সাক্ষী করে আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে—

মহামন্ত্রী : তা ছাড়া, রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা ছিল,—চণ্ডাল হোক পামর হোক, যে-কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে—

সৌরাষ্ট্রকুমার বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িলেন।

সৌরাষ্ট্রকুমার। ভস্ম হোক প্রশ্ন আর তার উত্তর। কুন্তলরাজ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই না। আমি চাই—

বিচার। যে চোর আমার অশ্ব আর বস্ত্রাদি চুরি করেছে সে আপনার জামাতাই হোক, আর—

মহামন্ত্রী: ধীরে কুমার, সংযম হারাবেন না—

সৌরাষ্ট্রকুমার: আমি বিচার চাই। কুন্তলরাজ্যের সীমানায় এই চুরি হয়েছে, তস্করকে শূলে দেওয়া হোক। আর তা যদি না হয়, সৌরাষ্ট্র দেশ নির্বীর্য্য নয়—একথা স্মরণ রাখবেন।

কুন্তলরাজ এই স্পর্দ্ধিত উক্তি গলাধঃকরণ করিলেন। ক্রোধে তাহার মুখ আরক্ত হইলেও এই ব্যক্তি যে সত্যই রাজপুত্র, সে প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল। তিনি সংযত স্বরে বলিলেন--

কুন্তলরাজ: এ বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান না ক'রে কিছুই হ'তে পারে না। আপনার অভিযোগ যদি সত্য হয়—

রাজা মহামন্ত্রীর পানে ফিরিলেন, চতুর মহামন্ত্রী রাজার প্রতি একটি গোপন কটাক্ষপাত করিয়া পরম আপ্যায়নের ভঙ্গীতে যুবরাজের দিকে ফিরিলেন—

মহামন্ত্রী: নিশ্চয় নিশ্চয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।—কিন্তু শ্রীমন্, আপনি আজ রাত্রিটা রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করুন—রাত্রির মধ্য যাম অতীত হয়েছে—

মহামন্ত্রী পুস্তপালের পেটে গোপনে কনুয়ের এক গুঁতা মারিলেন।

পুস্তপাল : হাঁ হাঁ—কুমার ভট্টারক, আর কালক্ষয় করবেন না—সারা দিন অভুক্ত আছেন—ক্লান্তিও কম হয় নি—আসুন কুমার—এই দিকে—এই যে বিশ্রান্তি গৃহ—

ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর যুবরাজের পক্ষে প্রলোভন প্রবল হইলেও তিনি সহজে নরম হইবার লোক নয়। তিনি বলিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার : আমি বিচার চাই, ন্যায়দণ্ড চাই, নইলে—

মহামন্ত্রী : অবশ্য অবশ্য—সে তো আছেই। উপস্থিত আপনার বস্ত্রাদি ত্যাগ করা প্রয়োজন—

পুস্তপাল : ওদিকে ময়ূর-মাংস, মাধ্বী, মাহিষ-দধি, দ্রাক্ষাসব—সমস্তই প্রস্তুত রয়েছে কুমার। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না—

মহামন্ত্রী : আসুন কুমার—অশুভস্য কালহরণম্—

সৌরাষ্ট্রকুমার : কিন্তু—প্রতিবিধান যদি না পাই—

তিনি আর লোভ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না. মহামন্ত্রী ও পুস্তপালের সাদর আহ্বানের অনুবর্তী হইয়া বিশ্রান্তি গৃহের অভিমুখে চলিলেন।

কুন্তলরাজ উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

কাট।

ইত্যবসরে রাজকুমারী ও কালিদাস শয়নকক্ষে উপনীত হইয়াছেন। সখী কিঙ্করীরাও বিদায় লইয়াছে; আড়ি পাতিয়া বর-বধূকে বিরক্ত করিবার বিধি যদিচ সেকালেও ছিল, কিন্তু আজকার দিনব্যাপী মাতামাতির পর সকলেই ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছিল। তাছাড়া বসন্তোৎসবের রাত্রে নিজস্ব সঙ্গমোৎকণ্ঠাও কম ছিল না।

নির্জ্জন সুবৃহৎ শয়নকক্ষটি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। যূথী ও মল্লী মিলিয়া পালঙ্কের শুভ্র আস্তরণ রচনা করিয়াছে। পালঙ্কের চারি কোণে দীপদণ্ডের মাথায় সুরভি বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে।

প্রাচীর-গাত্রে হরপার্ব্বতী, রাম-জানকী প্রভৃতি আদর্শ দম্পতির মিথুন চিত্র। একটি স্থান পর্দ্দায় আবৃত, পর্দ্দার উপর রাজহংসের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, হংসের চঞ্চুতে সনাল পদ্মকোরক।

রাজকুমারী কালিদাসকে লইয়া পর্দ্দার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, কালিদাসের দিকে মৃদু হাসিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন। দেখা গেল, প্রাচীরগাত্রে একটি কুলঙ্গী রহিয়াছে; কুলঙ্গীর থাকে থাকে অগণিত পুঁথি থরে থরে সাজানো।

কালিদাসের দৃষ্টি মুগ্ধ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পুঁথির প্রতি এই গ্রামীন যুবকের একটি অহৈতুক আকর্ষণ ছিল, তিনি একবার রাজকুমারীর দিকে, একবার পুঁথিগুলির দিকে হর্ষোৎফুল্ল মুখে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তারপর সন্তর্পণে একখানি পুঁথি হস্তে তুলিয়া পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পুঁথির মলাটের লিখন কালিদাস পড়িতে পারিলেন কি-না তিনিই জানেন; মলাটের উপর লেখা ছিল—

মৃচ্ছকটিকম্

কালিদাস: কত পুঁথি!—তুমি সব পড়েছ?

রাজকুমারী গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া সায় দিলেন।

কালিদাসের মুখ একটু ম্লান হইল। তিনি হাতের পুঁথিটির দিকে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়া সেটি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

কালিদাস : আমি একটিও পড়ি নি। যদি পড়তে পারতুম, আজকের চাঁদ কিসের মত সুন্দর হয় তো বল্‌তে পারতুম—

আবার রাজকুমারীর মুখ শুকাইল।

রাজকুমারী : কিন্তু—না না, পরিহাস করবেন না, আর্য্যপুত্র.! আপনি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ—

কালিদাসের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কালিদাস : কিন্তু আমি তো রাজপুত্তুর নই!

রাজকুমারীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাজকুমারী : রাজপুত্র নয়! তবে—কে আপনি ?

কালিদাস : আমি কালিদাস।—বনের মধ্যে কাঠ কাটছিলুম—এমন সময়—

রাজকুমারী বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী : কাঠ কাটছিলে! কাঠুরে! তুমি তবে সত্যিই বর্ণপরিচয়হীন মূর্খ!

সরল ভাবে কালিদাস মাথা নাড়িলেন।

কালিদাস : হাঁ—আমি লেখাপড়া জানি না।—যখনই কোনও সুন্দর জিনিস দেখি, ইচ্ছে করে তার বাখান করি। কিন্তু পারি না—

রাজকুমারী আর শুনিলেন না ; ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া দুই চক্ষু সজোরে মুদিত করিয়া যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর টলিতে টলিতে পালঙ্কের পাশে গিয়া নতজানু হইয়া শয্যার পুষ্পাস্তরণের মধ্যে মুখ গুঁজিলেন। প্রবল হৃদযোচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ উন্মথিত হইয়া উঠিল।

কালিদাস কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর ঈষৎ সঙ্কোচে রাজকুমারীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমারী জানিতে পারিলেন, কালিদাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি সহসা মুখ তুলিয়া তীব্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন—

রাজকুমারী : তুমি রাজপুত্র সেজে এখানে কি করে এলে ?

কুমারীর স্ফুরিতাধর মুখখানি দেখিয়া কালিদাস শঙ্কা ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধেও মুখখানি কী সুন্দর—ঠিক যেন—ঠিক যেন—। তিনি ক্রোধ দেখিতে পাইলেন না, সৌন্দর্য্যই দেখিলেন। উপরন্তু ভারি মজার কাহিনীটা রাজকুমারীকে শুনাইতে হইবে। কালিদাসের মুখে হাসি ফুটিল। তিনি আস্তেব্যস্তে শয্যাপাশে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন—

কালিদাস : সে ভারি মজার গল্প। শুনবে ?—তবে বলি শোন—

কাট।

রাজপ্রাসাদের বিশ্রান্তিগৃহে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ একখট্বার উপর পৃষ্ঠে বহু উপাধান দিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সবেমাত্র বিপুল পান-

ভোজন শেষ করিয়াছেন, খট্বার নিকটে একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর এখনও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পড়িয়া আছে। যুবরাজের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতেছে, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। একটি কিঙ্করী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে।

পুস্তপাল মহাশয় স্ফটিকপাত্রে দ্রাক্ষাসব ভরিয়া যুবরাজের সম্মুখে ধরিলেন। যুবরাজ এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং জড়িত-স্বরে কহিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: বিচার···জামাতাই হোক আর বিমাতাই হোক—শূলে দেওয়া চাই··নচেৎ—

তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার নাসিকা হঠাৎ ঘর্ঘর শব্দ করিয়া উঠিল।

পুস্তপাল কিঙ্করীকে ইঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া জানাইলেন--আরও জোরে পাখা চালাও। তারপর কতক নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশব্দ বিড়ালগতিতে দ্বারের পানে চলিলেন।

দ্বারের ঠিক বাহিরেই কুন্তলরাজ ও মহামন্ত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুস্তপালকে আসিতে দেখিয়া যুগপৎ ভ্রূ দ্বারা প্রশ্ন করিলেন। পুস্তপালও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিলেন যে যুবরাজ নিদ্রিত।

তিনজনে একত্র হইলে মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

কুন্তলরাজ: আজ রাত্রির মত নিশ্চিন্ত। কিন্তু—তারপর?

মহামন্ত্রী: উভয় সঙ্কট। এক, রাজ-জামাতাকে শূলে দিতে হয়—নচেৎ—

কুন্তলরাজ : সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ—

তিন জনে পরস্পর চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

মহামন্ত্রী : যদি যুদ্ধ হয়, সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় আমাদের কোনও আশা নেই—

কুন্তলরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

কুন্তলরাজ : অর্থাৎ—রাজ্য ছারখার হবে—

তিনজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। সহসা ঘরের ভিতর হইতে সৌরাষ্ট্রকুমারের কণ্ঠস্বর আসিল ; তিনি নিদ্রাবশে বিকৃত কণ্ঠে বলিতেছেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার : প্রতিশোধ—শূল—

পুস্তপাল গলা বাড়াইয়া দেখিলেন যুবরাজ ঘুমন্ত পাশ ফিরিতেছেন, পুস্তপাল কিঙ্করীকে জোরে পাখা চালাইবার ইসারা করিলেন। যুবরাজের গলার মধ্যে বাকি কথাগুলা অস্পষ্ট রহিয়া গেল—

সৌরাষ্ট্রকুমার :—চোরের দণ্ড—শূল দণ্ড !

তিনজন পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন। কুন্তলরাজ এতক্ষণ লৌহবলে নিজেকে সংযত রাখিয়াছিলেন, এইবার তিনি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। উদ্গত বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠে রোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কুন্তলরাজ : আমার কন্যা—

তাঁহার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

মহামন্ত্রী ও পুস্তপাল অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। মহামন্ত্রীর মুখ দুরূহ-দ্রুত চিন্তায় ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। একটা কিছু উপায় বাহির করিতেই হইবে—করিতেই হইবে—

তিনি সহসা রাজার দিকে ফিরিলেন; তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া রাজা ও পুস্তপাল সাগ্রহে আরও কাছাকাছি হইয়া দাঁড়াইলেন।

মহামন্ত্রী : রাজ-জামাতার প্রাণরক্ষার এক উপায় আছে—

তিনি সচকিতে বিশ্রান্তি গৃহের দিকে তাকাইলেন, তারপর গলা আরও খাটো করিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রী : আজ রাত্রেই তাঁকে চুপি চুপি রাজ্য থেকে—

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি এমন ভাবে হস্তটি সঞ্চালন করিলেন যাহাতে বুঝা যায় যে তিনি রাজ-জামাতাকে বহু দূরে প্রেরণ করিতে চাহেন। রাজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন, তারপর অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজ : কিন্তু—বিবাহের রাত্রেই আমার কন্যা—

মহামন্ত্রী : অন্তত রাজকন্যা বিধবা তো হবেন না।

উভয়ে কিছুক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে পরস্পর চাহিয়া রহিলেন, তারপর রাজা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন।

কাট্।

শয়ন-মন্দিরে কালিদাস গল্প বলা শেষ করিয়াছেন। রাজকুমারী তেমনি শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া আছেন, ক্ষোভে হতাশায় তাঁহার চোখে যে ধিকি

ধিকি আগুন জ্বলিতেছে, তাহা কালিদাস দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না তিনি হাসিতে হাসিতে কাহিনী শেষ করিলেন—

কালিদাস: তারপর এখানেও সকলে আমাকে সৌরাটের যুবরাজ বলে ভুল করলে—ভারি মজা হল—না?

রাজকুমারী বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

রাজকুমারী: মজা—! হা অদৃষ্ট! আমার ললাটে বিধি এই লিখেছিলেন! একটা কাঠুরের সঙ্গে—তাতেও ক্ষতি ছিল না,—কিন্তু তুমি মূর্খ—মূর্খ! পৃথিবীতে যা আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি,—তুমি তাই—

রাজকুমারী আবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন। হাস্যরত বালকের গণ্ডে অকস্মাৎ চপেটাঘাত করিলে তাহার মুখভাব যেরূপ হয় কালিদাসেরও সেইরূপ হইল। কোথায় কি ভাবে তিনি কোন্ অপরাধ করিয়াছেন, কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। রাজকুমারীর স্কন্ধ ও অংস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, কালিদাস ব্যথিত স্বরে বলিলেন—

কালিদাস: রাজকুমারী, তুমি আমার ওপর রাগ করলে? কিন্তু আমি তো কোনও দোষ করি নি! রাজকুমারী—

তিনি সঙ্কোচভরে কুমারীর স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে কুপিতা সর্পীর মত রাজকুমারী তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রাজকুমারী : ছুঁয়ো না! কোন্ স্পর্দ্ধায় তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর ?—মূর্খ, নিরক্ষর, গ্রামীণ!

প্রত্যেকটি শব্দ নিষ্ঠুর কশাঘাতের মত কালিদাসের মুখে পড়িল. এই সময় দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া রাজকুমারী জ্বলন্ত চক্ষু সেদিকে ফিরাইযাই বলিযা উঠিলেন--

রাজকুমারী : ওঃ পিতা!

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে রাজা আসিতেছিলেন, কুমারী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িলেন, জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারী : রাজাধিরাজ, আমাকে রক্ষা করুন—এই নিরক্ষর গ্রামীণের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন—

রাজা বুঝিলেন কুমারীও সত্য কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি কন্যার মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া কঠোর চক্ষে কালিদাসের পানে চাহিলেন।

কুন্তলরাজ : হুঁ।—এদিকে এস।

কালিদাস কুণ্ঠিত পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ক্ষণকাল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কঠিন স্বরে কহিলেন--

কুন্তলরাজ : তুমি শঠতা করে কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছ!

কালিদাস : শঠতা!

রাজার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ মিশিল

কুন্তলরাজ: প্রিয়দর্শন বালক, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল ? তুমি চুরি করতে গেলে কেন ?

পাণ্ডুর মুখে কালিদাস চাহিয়া রহিলেন ; ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—

কালিদাস: চুরি ! কিন্তু আমি তো চুরি করি নি—

কুন্তলরাজ: করেছ ! শুধু তাই নয়, আমার রাজ্যের সর্ব্বনাশ করতে বসেছ, কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। এস আমার সঙ্গে !

কন্যার দিকে হেঁট হইয়া গাঢস্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজ: কন্যা, অধীর হযো না। তুমি রাজদুহিতা—বিদুষী। ধৈর্য্য হারিও না !

কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া রাজা কালিদাসকে সংক্ষিপ্ত আদেশ করিলেন—

কুন্তলরাজ: এস।

রাজা ফিরিয়া চলিলেন, কালিদাস তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অনুবর্ত্তী হইলেন। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া কালিদাস একবার ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী তেমনি নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার ক্ষোভ-বিধ্বস্ত মুখখানি বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

আকাশে চন্দ্র পশ্চিমে চলিয়া পড়িয়াছে। তোরণের দীপগুলি কতক নিবিয়া গিয়াছে, কতক নিব-নিব। নগরীর শব্দ-গুঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনটি

কালিদাস

অশ্ব তোরণ-সম্মুখে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। দুই পাশের দুটি অশ্বের পৃষ্ঠে দুইজন রক্ষী; মধ্যে কালিদাস। কালিদাসের দুই হস্ত পৃথকভাবে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ; প্রত্যেক রক্ষী একটি করিয়া রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া আছে। প্রধান রক্ষী মস্তক সঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিল। তখন তিনটি অশ্ব একসঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সম্মিলিত ক্ষুরধ্বনি চন্দ্রালোকিত নিশাপের মৌন তন্দ্রা পলকের জন্য সচকিত করিয়া তুলিল।

ওয়াইপ্।

নিবিড় বনের উপান্ত। অশোকস্তম্ভের ন্যায় একটি স্তম্ভ এই নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া কুন্তলরাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ করিতেছে। অস্তমান চন্দ্রের দূরপ্রসারী ছায়া ভূমির উপর কৃষ্ণ সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে।

তিনটি অশ্ব স্তম্ভের পাশে ছায়ারেখার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। রক্ষী দুইজন কালিদাসের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল, প্রধান রক্ষী নিঃশব্দে কালিদাসকে অশ্ব হইতে নামিবার ইঙ্গিত করিল। কালিদাস নামিলেন। প্রধান রক্ষী সম্মুখের অরণ্যানীর দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—

রক্ষী: যাও, আর কখনও এ রাজ্যে পদার্পণ ক'রো না। মনে রেখো কুন্তলরাজ্যে প্রবেশ করলেই তোমার শূলদণ্ড—

কালিদাস বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া স্খলিত পদে বনের দিকে চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, রক্ষীরা স্থিরভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া, শূন্যপৃষ্ঠ অশ্বটিকে মধ্যে লইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে মন্থরগতিতে ফিরিয়া চলিল।

কালিদাস

ফেড্ আউট।

ফেড্ ইন্।

প্রভাত। বনের পাতায় পাতায় সোনালি সূর্য্যকিরণ লাগিয়াছে, মাকড়শা'র জালে শিশিরবিন্দু এখনও শুকাইয়া যায় নাই। পাখীর কলধ্বনি ও বানরের কিচিমিচিতে বনস্থলী পূর্ণ।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহার স্থূল মূলগুলি স্থানে স্থানে মাটির গোপনতা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ একটি মূলের উপর মাথা রাখিয়া কালিদাস উপুড় হইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহার শয়নের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, রাত্রে অন্ধকারে যেখানে হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছেন, সেইখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

একটি বানর-শিশু এই সময় এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের কোল ঘেঁষিয়া বসিল এবং একটি বৃক্ষচ্যুত ফল তুলিয়া লইয়া সেটিকে পরম যত্নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঘুমন্ত কালিদাসের অঙ্গে উষ্ণ স্পর্শ লাগিতেই তিনি একটি হাত দিয়া বানর শিশুটিকে জড়াইয়া লইলেন। বানর-শিশু এই আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ভয় পাইয়া কালিদাসের হাতে এক কামড় দিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। কালিদাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এক হাতে ভর দিয়া কালিদাস ক্লান্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। বেশবাস ছিন্ন, অঙ্গ ধূলিমলিন; চোখের কোণে ও গণ্ডে অশ্রুর চিহ্ন শুকাইয়া আছে। দেহ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তবু তিনি চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তারপর দীর্ঘ একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া শ্লথচরণে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কালিদাস

ডিজলভ্ ।

মরুভূমির অগ্নিবর্ষী দ্বিপ্রহর। বালুকণা উড়িয়া আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। এই তপ্ত বালুঝটিকার ভিতর দিয়া উন্মত্ত দিগ্‌ভ্রান্তের মত কালিদাস চলিয়াছেন। তাঁহার মুখে চোখে কোন্ এক দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষা জ্বলিতেছে; বহিঃপ্রকৃতির প্রচণ্ডতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই।

বালু-কুজ্‌ঝটিকার ভিতর দিয়া একটি ভগ্ন দেবায়তনের বহিঃপ্রাচীর দেখা গেল। কালিদাস সেইদিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন; প্রাচীরের নিকটবর্তী হইয়া তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলেন।

প্রাচীর ধরিয়া কোনও ক্রমে উঠিযা দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণকাল ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিযা রহিলেন। তারপর চোখ খুলিয়া দেখিলেন তিনি যেস্থানে বাহুর ভর দিযা দাঁড়াইয়া আছেন উহা একটি বিরাট মূর্ত্তির উরুস্থল। কালিদাস উর্দ্ধে চাহিলেন; প্রাচীরে খোদিত বিশাল শঙ্কর-মূর্ত্তি যেন এই বহ্নি-শ্মশানে তপস্যা-রত। কালিদাস নতজানু হইযা মূর্ত্তির পদমূলে মাথা রাখিলেন, তারপর গলদশ্রু চক্ষু দেবতার মুখের পানে তুলিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন—

কালিদাস : দেবতা, বিদ্যা দাও!

দিগন্তহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত হইতেছে। কালিদাস একাকী সেইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বলিতেছেন-

কালিদাস : সূর্য্যদেব, তুমি জগতের অন্ধকার দূর কর, আমার মনের অন্ধকার দূর করে দাও। বিদ্যা দাও!

কালিদাস

ডিজল্ভ্

মহাকালের মন্দির। কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আকাশে চূড়া তুলিয়াছে, চূড়ার স্বর্ণ-ত্রিশূল দিনান্তের অস্তরাগ অঙ্গে মাখিয়া জ্বলিতেছে। সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর রবে বাজিতেছে। মন্দির অঙ্গনে লোকারণ্য। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জোড়হস্তে তদ্গতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আরতি শেষ হইলে সকলে অঙ্গনের উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণত হইল। প্রাঙ্গণের এক কোণে এক বৃদ্ধ প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুক্তকরে মন্দিরের পানে চাহিয়া প্রার্থনা করিল—

বৃদ্ধ : মহাকাল, আয়ু দাও!

অনতিদূরে একটি নারী নতজানু অবস্থায় মন্দির উদ্দেশ করিয়া কহিল -

নারী : মহাকাল, পুত্র দাও—

বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণধারী এক সৈনিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সৈনিক : মহাকাল, বিজয় দাও—

বিনতভুবনবিজয়ীনয়না একটি নবযুবতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—

যুবতী : মহাকাল, মনোমত পতি দাও—

দীনবেশী শীর্ণমুখ কালিদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাস : মহাকাল, বিদ্যা দাও!

কালিদাস

ডিজল্ভ্ ।

পাতা-ঝরা একটি কানন। নিষ্পত্র বৃক্ষশাখাগুলি আকাশে জাল রচনা করিয়াছে। নির্বিঘ্ন আলোক বনতলের কুণ্ঠিত লজ্জা হরণ করিয়া লইয়া ভূ-লুণ্ঠিত শুষ্ক পল্লবের মধ্যে সকৌতুক ক্রীড়া করিতেছে।

একটি আট-নয় বছরের গৌরাঙ্গী বালিকা এই বনভূমির উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, কণ্ঠে কুন্তলে বাহুতে শ্বেত পুষ্পের আভরণ। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পিছনে তাকাইতেছে, আবার নাচিতে নাচিতে আগে চলিয়াছে।

বালিকা : নীল সরসী জলে সিত কমলদলে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

লাস্যচপলচরণে বালিকা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল ; তাহার গানের ধ্বনিও ক্ষীণ হইয়া আসিল।

কাট্ ।

বনের অন্য অংশ। কালিদাস মোহগ্রস্তের মত বালিকার সঙ্গীতধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ বিশীর্ণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ; এক দুরন্ত উৎকণ্ঠা তাঁহাকে ঐ অশরীরী সঙ্গীতের পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

কাট্ ।

বালিকা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

বালিকা : হিম তুষার গলা আমি নির্ঝরিণী
মোর নূপুর বাজে রুম্ রিণ্ কি ঝিণি
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি ।

উপলবঙ্কিমগতি একটি শীর্ণ জলধারা লঙ্ঘন করিয়া বালিকা
নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল ।

তাহার গানের রেশ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই কালিদাসকে আসিতে দেখা গেল । ব্যগ্রচক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে তিনি আসিতেছেন । কোথায় গেল সে সঙ্গীতময়ী ? জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, তারপর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া চলিতে লাগিলেন ।

কাট্ ।

বালিকা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছে । দূর পশ্চাৎপটে একটি
কমলপূর্ণ সরোবর ; বালিকা সেইদিকে চলিয়াছে—

বালিকা ! যেথা মরাল চাহে—ফিরি ফিরি
যেথা কপোত গাহে—ধীরি ধীরি—
তীর বনে—নিরজনে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি ।

বালিকা দূরে চলিয়া গিয়াছে ; কালিদাস তাহাকে দেখিতে পাইয়া উন্মাদের মত তাহার পশ্চাতে চলিয়াছেন। সরোবরের ঘাটে দাঁড়াইয়া বালিকা একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল ; তারপর মৃদু হাসিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল।

কালিদাস যখন ঘাটে পৌঁছিলেন তখন বালিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে একদল কমল বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন বালিকা এইমাত্র জলে ডুব দিয়া ঐখানে অদৃশ্য হইয়াছে। ঘাটের নিম্নতন সোপানে দাঁড়াইয়া কালিদাস পাগলের মত জলের পানে চাহিলেন—

কালিদাস : কোথায় গেলে ? দেবি, তুমি কোথায় গেলে ?—

বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল ;
চঞ্চল পদ্মগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া
তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন—

কালিদাস : দেবি, শুনেছি তুমি পদ্মবনে থাকো—আমাকে দয়া কর, বিদ্যা দাও—নইলে—নইলে—

কালিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া ঘাটের উপর পড়িয়া গেলেন।

ডিজল্‌ভ্‌।

মূর্চ্ছিত কালিদাস স্বপ্ন দেখিলেন, সরোবরের স্বচ্ছ জলতলে তিনি শুইয়া আছেন ; দিক্-আলো-করা এক পূর্ণযৌবনবতী দেবীমূর্ত্তি শুচিস্মিত হাস্যে তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—

দেবী : কালিদাস।

কালিদাসের ভাবাতুর নেত্র নিমীলিত ; তিনি যুক্তকরে গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাস : মা !

দেবী : তুমি আমার বরপুত্র, তোমার কাব্য জগতে অমর হয়ে থাকবে। বারাণসী যাও, সেখানে আচার্য্য পাবে। ওঠ বৎস।

কালিদাস হর্ষোৎফুল্ল মুখে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল উচ্চারিত হইল—

কালিদাস : মা মা মা—

দেবী অবনত হইয়া কালিদাসের শিরশ্চুম্বন করিলেন। তারপর অপূর্ব্ব সুন্দর জ্যোতিরুৎসবের মধ্যে দেবী-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফেড্ আউট্

মধ্য বিরাম

কালিদাস

ফেড্ ইন্

ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

কুন্তল রাজপুরীতে রাজকুমারীর মহল। একটি কক্ষে রাজকুমারী ভূমির উপর অজিনাসনে বসিয়া আছেন ; তাঁহার সম্মুখে নিম্ন কাষ্ঠাসনের উপর একটি উন্মুক্ত পুঁথি। রাজকুমারী তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন।

পাঁচ বৎসরে রাজকুমারীর দেহলাবণ্যের অতি অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার দেহে সূক্ষ্ম শুভ্র কার্পাসবস্ত্র, কেশ একটিমাত্র বেণীতে আবদ্ধ, ললাটে আয়তির চিহ্ন কেবল একটি কস্তুরীর টিপ—অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে। চুলের ঈষৎ রুক্ষতায়, চোখের কোলে ছায়ার নিবিড়তায়, দেহের অল্প কৃশতায় তাঁহার রূপ যেন বাহুল্যবর্জ্জন করিয়া নিষ্কলুষ হইয়া উঠিয়াছে—বর্ষার অন্তে স্বচ্ছসলিলা শরতের স্রোতস্বিনীর মত।

পুঁথি পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে প্রবল ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল ; তিনি কম্পিতকণ্ঠে কাব্যের শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিলেন—

রাজকুমারী। "মাভূদ্ এবং ক্ষণমপি চতে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগ॥"

গবাক্ষপথে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি বাহিরে প্রেরণ করিয়া রাজকুমারী ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। দেখা গেল পুঁথির মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

মেঘদূতম্—ক ৷লিদাস বিরচিতম্

পুঁথির উপর হাত রাখিয়া রাজকুমারী উন্মনা হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু পুঁথির উপর ফিরিয়া আসিল। কালিদাসের নামের উপর ললাট নত করিয়া তিনি শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিলেন।

রাজকুমারী : ধন্য কবি।—

নামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের ভাব আবার উন্মনা হইল ; তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী : কালিদাস ! কে তিনি ?

তাঁহার অধর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন।

রাজকুমারী : না না ··· সে তো মূর্খ ছিল—

তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিলেন। পরে দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল, দ্বারের চৌকাঠে হাত রাখিয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া রাজকন্যা বলিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারী : পিতা !

কুন্তলরাজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কুমারী আসন ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী : আসুন আর্য্য :

রাজা হাত তুলিয়া কন্যাকে নিবৃত্ত করিলেন।

কুন্তলরাজ : বোসো বোসো বৎসে—

রাজা আসিয়া কন্যার নিকটে দ্বিতীয় অজিনে আসন গ্রহণ করিলেন। সহজভাবে বলিলেন—

কুন্তলরাজ : কী পড়ছিলে ?

রাজকুমারী ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুঁথিটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—

রাজকুমারী : কিছু নয় পিতা।—একটি নতুন কাব্য—মেঘদূত।

রাজা প্রীতভাবে ঘাড় নাড়িলেন। সেকালে পিতাপুত্রীতে কাব্য আলোচনা, এমন কি আদিরসঘটিত কাব্যের আলোচনা, কেহ দূষণীয় মনে করিতেন না ; আদিরসের প্রতি তাঁহাদের সম্ভ্রম ছিল।

কুন্তলরাজ : মেঘদূত—বিরহী যক্ষ আর বিরহিনী যক্ষপত্নী ! আমি পড়েছি। সুন্দর কাব্য !

রাজকুমারী পিতার দিকে উদ্দীপ্ত চক্ষু ফিরাইলেন ; যে কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার মন আষাঢের মেঘের মতই দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার এইটুকু প্রশংসা তাঁহার মনঃপূত হইল না—

রাজকুমারী : সুন্দর কী বলছেন, পিতা—অপূর্ব্ব। ভাষায় এর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই : আমি বারবার পড়েছি, তবু আবার পড়তে ইচ্ছা করে—

কুন্তলরাজ কন্যার উৎসাহ দেখিয়া স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িলেন।

কুন্তলরাজ : সত্যই অপূর্ব্ব।—কাব্যজগতে এক নূতন সৃষ্টি। —(কন্যার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া) তুমি যে কাব্যশাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছো, এতে আমার মনে একটু শান্তি হচ্ছে—

রাজকুমারীর চোখের দীপ্তি নিবিয়া গেল ; তিনি মুখ নত করিলেন।
রাজা একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া কতকটা নিজ মনেই
বলিতে লাগিলেন—

কুন্তলরাজ : পাঁচ বছর হয়ে গেল ··· সেই রাত্রে চুপি চুপি তাকে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছিলুম, তারপর কিছুই জানি না। গোপনে গোপনে কত খোঁজ করিয়েছি—

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন, কিন্তু পিতার প্রতি না চাহিয়াই ধীরকণ্ঠে
বলিলেন—

রাজকুমারী : প্রয়োজন কি পিতা! আমি তো বেশ আছি—ভালই আছি—

রাজা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন

কুন্তলরাজ : না বৎসে। ভালই যদি থাকবে তো মাঝে মাঝে তোমার চোখে জল দেখি কেন ? এই তো এখনই—

রাজকুমারী : ও কিছু নয় পিতা, কাব্য পড়তে পড়তে—

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল।

কুন্তলরাজ : মা, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি এখনও তাকে ভুলতে পারনি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন) আমিও পারিনি।—কি জানি কী ছিল তার সেই সরল সুকুমার মুখে! যদি তাকে পাই, ফিরিয়ে নিয়ে আসি—

কালিদাস

রাজকুমারী সহসা পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া উঠিলেন, কণ্ঠস্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী : না না পিতা—সে মূর্খ—নিরক্ষর !—

রাজা বুঝিলেন কন্যার মনে প্রেম ও অভিমানে কী দ্বন্দ্ব চলিতেছে ; তিনি শান্তস্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজ : সে তোমার স্বামী।

কাট্।

সিপ্রা নদীর বুকের উপর দিয়া একটি মধ্যমাকৃতি মহাজনী নৌকা পালের ভরে তর-তর করিয়া চলিয়াছে। পাশে সিপ্রার তীরে মালব রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী মহানগরী তাহার অসংখ্য ঘাট মন্দির সৌধ লইয়া দ্বিপ্রহরের প্রদীপ্ত আলোকে জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। নগরীর সীমান্তে শষ্প-হরিত প্রান্তর ; মাঝে মাঝে দুই-একটি কুটির ; জলের কিনারায় সৈকতলীন হংসমিথুন—

নৌকার ছাদের উপর পালের ছায়ায় একটি পুরুষ বসিয়া যন্ত্র সহযোগে গান করিতেছেন। পরিধানে অতি সাধারণ শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয় ; ললাটে শ্বেত চন্দনের তিলক। পাঁচ বৎসরে তাঁহার বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই, তেমনি সরল হাসিটি মুখে লাগিয়া আছে ; কিন্তু তবু মনে হয় এ ব্যক্তি সে-ব্যক্তি নয়—অন্তর্লোকে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস যে-যন্ত্রটি বাজাইয়া গান করিতেছেন উহা সম্ভবত নাবিকদের তাহারও স্বরচিত সম্পত্তি—একটি বক্রাকৃতি তুম্বের শূন্যগর্ভ খোলসের উপর তিনটি তার চড়ানো। কালিদাস তাহারই সাহায্যে অগ্রসকণ্ঠে গাহিতেছেন ; নৌকার মাঝি হাল ধরিয়া পিছনে বসিয়া আছে এবং মাথাটি গানের তালে তালে আন্দোলিত করিতেছে। নৌকার অন্যান্য নাবিকেরা বোধ করি নিম্নে আহারাদি সম্পন্ন করিতেছে।

কালিদাস

কালিদাস ঃ আমার মন-তরণী ভাসল দরিয়ায়
মরি হায় মরি হায় রে।
দখিন বায়ে রূপলহরে, চল্‌ছে তরী পালের ভরে
কিনার ডাকে কলস্বরে, আয়রে তরি আয়।
মরি হায় মরি হায় রে!
কোন্ ঘাটেতে পথিক-বধূ, আছেরে পথ চেয়ে
সেই কিনারে বৈঠা তুলে, ভিড়াস তরী, নেয়ে—
যেথা কমল চোখে সজল হাসি, আঝোর ঝরি যায়।
মরি হায় মরি হায় রে।

গান শেষ হইলে কালিদাস যন্ত্রটি নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া বসিলেন; অমনি উজ্জয়িনীর রবিকরোজ্জ্বল দৃশ্যটী তাঁহার বিস্ময়োৎফুল্ল দৃষ্টি টানিয়া লইল—তিনি মুগ্ধ-চক্ষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর কতক আত্মগত ভাবে বলিলেন—

কালিদাস ঃ বাঃ—কী চমৎকার নগরী! যেন আমার কল্প-লোকের অলকাপুরী—

কবি মাঝির দিকে মুখ ফিরাইলেন

কালিদাস ঃ ভাই মাঝি, এটা কোন্ রাজ্য?

মাঝি একবার তীরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল।

মাঝি ঃ ঠাকুর, এটা অবন্তী রাজ্য। আমরা এখন উজ্জয়িনীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি—

কালিদাস : (তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া) অবন্তী ! উজ্জয়িনী ! এতদিন শুধু কল্পনাই করেছি !—এর পর ?

মাঝি : এর পরই কুন্তলরাজ্য ।

কালিদাসের মুগ্ধ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল ; তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন ।

কালিদাস : কুন্তলরাজ্য ?

মাঝি : হাঁ । কিন্তু কুন্তলরাজ্য অবন্তীর কাছে লাগে না ।—এখানকার রাজা বিক্রমাদিত্য একজন মহাবীর ; হিঙ্গুভোজী হূণদের উনিই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন—ভারী তেজী রাজা । শুনেছি নাকি পণ্ডিতদেরও খুব আদর করেন—

মাঝি যতক্ষণ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় দিতেছিল কালিদাস ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল , মাঝি থামিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাস : ভাই মাঝি আমাকে তুমি এখানেই নামিয়ে দাও ।

মাঝি ঈষৎ বিস্ময়ে মুখ তুলিল ।

মাঝি : এইখানেই ?—

কালিদাসের দৃষ্টি সিপ্রার তীরভূমি চুম্বন করিয়া চলিয়াছিল ; তিনি মাঝির দিকে না ফিরিয়াই বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাস : হ্যাঁ—এইখানেই ! আমার কাছে সব রাজ্যই তো সমান । এই উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে নদীর তীরে কুটির বেঁধে আমি থাকব ।

মাঝি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

মাঝি। তা বেশ, আপনার যা ইচ্ছে ঠাকুর।—ওরে ওরে পাল নামা—

মাঝি হালের মুখ ফিরাইয়া ধরিল।

ফেড্ আউট।

ফেড্ ইন্।

উজ্জয়িনীর সীমান্তে সিপ্রার উপকূল। তীরভূমি ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে। তীরে দূরে দূরে দু-একটি উপবন বেষ্টিত কুটির। যাহারা ফুলের চাষ করে তাহাদের নগরের বাহিরেই সুবিধা, তাই মালাকরেরা এই দিকেই পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছে।

জলের কিনারা দিয়া যে হাঁটা-পথ গিয়াছে, সেই পথে মালিনী নগরের দিকে চলিয়াছিল। তাহার বিশেষ তাড়া ছিল না, সূর্য্যাস্তের এখনও বিলম্ব আছে। বাঁ হাতের মণিবন্ধ হইতে ফুলের সাজি ঝুলিতেছে, ডান হাতে সূচী ও সূত্রের সাহায্যে মালা গড়িয়া উঠিতেছে; মালিনী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

মালিনীর বয়স ষোলো-সতেরো বছর—শ্যামকান্তি পল্লবিতা লতার মতন; মনে ও দেহে দুই-একটি কুঁড়ি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। (মালব দেশের মালিনীদের যৌবন যেমন বিলম্বে আসে, তেমনি বিলম্বে যায়)। মালিনী দেখিতে ছোট-খাট, চঞ্চলা, হাস্যময়ী; চুলগুলি চিকণ করিয়া বাঁধা। পরিধানে বাসন্তী রঙ শাড়ী, কাছা দিয়া খাটো করিয়া পরা; উর্দ্ধাঙ্গে বাসন্তী-রঙ আঙ্‌রাখা আঁট হইয়া গায়ে বসিয়া আছে।

মালিনী চলিতে চলিতে মালা গাঁথিতেছে, তাহার চক্ষু তাহাতেই নিবদ্ধ। যে গানটি ঈষদুন্মুক্ত অধর হইতে নিঃসৃত হইতেছে তাহাও বেশী দূরে যাইতেছে না, ফুলের চারিপাশে ভ্রমরের মত মালিনীকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

কালিদাস

মালিনী : মালা গাঁথব না আর চাঁপায়।
ওরে দেখলে আমার নয়ন ভরে' অশ্রু কেন ছাপায়।
মালা গাঁথব না আর চাঁপায়॥
ও যে বুকে লাগায় দোলা, প্রাণ করে উতলা
মোর মরমবীণার তারগুলিরে কাঁপায়।
মালা গাঁথব না আর চাঁপায়॥

মালিনীর চরণ ভঙ্গীতে একটু নৃত্যের সংস্পর্শ ছিল , গানের শেষে সে এক পাক ঘুরিয়া চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি, হঠাৎ একটা নূতন কুটির কোথা হইতে আসিল ? সাতদিন আগেও তো কিছু ছিল না !

নদীতীর হইতে পঞ্চাশ হাত ব্যবধানে উঁচু জমির উপর সত্যই একটি নূতন কুটির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট পাহাড়ী বেত্রের উপর মাটির প্রলেপ দিয়া দেয়াল ; উপরে কুশের ছাউনি। সম্মুখের খানিকটা স্থানে ছিটা-বেড়ার বেষ্টনী ; তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বেদিকা।

কুটির সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার প্রসাধন ও অঙ্গশোভা এখনও বাকি আছে। স্বয়ং গৃহস্বামী অধুনা এই কার্য্যে ব্যাপৃত। এক হাতে পিটুলিপূর্ণ ভাঁড় ও অন্য হাতে দাঁতনের মত একটি তুলি লইয়া তিনি অভিনিবেশ সহকারে গৃহ-দ্বারের উপর শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিত্রলেখায় প্রবৃত্ত।

দূর হইতে দেখিয়া মালিনী কৌতূহলবশে সেই দিকে অগ্রসর হইল। পা টিপিয়া কালিদাসের পিছনে গিয়া উপস্থিত হইল , কালিদাস চিত্র রচনায় এতই নিমগ্ন যে কিছুই জানিতে পারিলেন না—

চিত্র-বিদ্যায় কবির পটুত্ব কিছু কম। দ্বারের একটি কবাটে তিনি যে শঙ্খটি আঁকিয়াছেন তাহা যে শঙ্খই এমন কথা জোর করিয়া বলা শক্ত, কুণ্ডলায়িত বিষধর

সর্পও হইতে পারে। এই জন্য কবি তাহার নিম্নে স্পষ্টাক্ষরে চিত্রপরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন—"শঙ্খ"। উপস্থিত যে চক্রটি আঁকিতেছেন তাহাও আশানুরূপ আকার গ্রহণ করিতেছে না। সুদর্শন চক্র গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কবির হস্তে উহা ডিম্বের আকৃতি ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তা ছাড়া তুলিটাও ভদ্র ব্যবহার করিতেছে না, অতর্কিতে কবির মুখে চোখে রঙ্ ছিটাইয়া দিতেছে।

কালিদাস শেষে উত্যক্ত হইয়া তুলির দ্বারা চক্রের মাঝখানে একটা খোঁচা দিলেন। তুলির রঙ্ অমনি ধারাব মত গড়াইয়া পড়িল। মালিনী এতক্ষণ কালিদাসের পিছনে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল, এখন খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চমকিয়া কালিদাস ফিরিলেন। হাতের তুলিটা কেমন একভাবে ছিটকাইয়া উঠিয়া মালিনীর মুখ চোখে রঙ্ ছিটাইয়া দিল।

মালিনী মুখখানি একবার কুঞ্চিত করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল—

মালিনী: কেমন মানুষ গা তুমি? আমার মুখেও চিত্তির আঁকবে নাকি?

কালিদাস অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন।

কালিদাস: দেখতে পাইনি—ভারি অন্যায় হয়েছে।—তা—এ চূণ নয়, পিটুলি গোলা—তোমার মুখের কোনও ক্ষতি হবে না—বরং—বেশ দেখাচ্ছে—

মালিনীর মুখে শ্বেত বিন্দুগুলি তিলকের মত ফুটিয়া উঠিয়া সত্যই সুন্দর দেখাইতেছিল; সে স্মিতমুখে এই কান্তিমান তরুণ ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল; লোকটি দেখিতেও ভাল, কথাও বলে বেশ মিষ্ট।

মালিনী : তুমি নতুন এসেছ—না ? সাত দিন আগেও এ পথে গেছি, তোমার কুঁড়েঘর তো ছিল না !

কালিদাস : নাঃ, এই তো ক'দিন হ'ল এসেছি। (সগর্ব্বে গৃহের পানে তাকাইযা) নিজের হাতে ঘর তৈরি করেছি ! কেমন, চমৎকার হয়নি ?

মালিনী : বেশ হয়েছে।—ওটা কি হচ্ছিল ?

মালিনীর তর্জ্জনীনির্দ্দেশ অনুসরণে দ্বারের শঙ্খচক্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কালিদাস লজ্জিত হইলেন। আম্‌তা আম্‌তা কবিযা বলিলেন—

কালিদাস : মঙ্গলচিহ্ন আঁকছিলুম। তা ঐ হযেছে।

বলিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন। মালিনীও হাসিল। ফুলের মালা সাজির মধ্যে রাখিয়া সর্ব্বসুদ্ধ কালিদাসের হাতে ধরাইযা দিয়া বলিল—

মালিনী : তুমি সাজি ধর, আমি এঁকে দিচ্ছি। আল্‌পনা দেওয়া কি পুরুষের কাজ !

ভাঁড় হাতে লইয়া মালিনী দ্বারের নিকটে গেল, কালিদাস পুলকিত হইযা উঠিলেন।

কালিদাস : তুমি এঁকে দেবে !—বাঃ, তা হ'লে তো কথাই নেই।—আমরা পুরুষেরা শুধু মোটা কাজ করতে পারি, সূক্ষ্ম কাজ মেযেরা না হ'লে । না—

মালিনী হাস্যমুখে স্বজাতির এই প্রশংসা আত্মসাৎ করিয়া আল্পনা অঙ্কনে মন দিল ; পূর্ব্বের অঙ্কন মুছিয়া দক্ষহস্তে নূতন করিয়া শঙ্খ আঁকিতে লাগিল। কালিদাস সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কালিদাস : ভাল কথা, তুমি কে তা তো বললে না?

মালিনী ভ্রূভঙ্গী করিয়া একবার ঘাড় ফিরাইল ; তারপর আবার আল্পনায় মন দিয়া বলিল—

মালিনী : ফুলের সাজি দেখে বুঝ্‌লে না?—মালিনী।

কালিদাস ও, তা বটে। কিন্তু তোমার একটা নাম আছে তো?

মালিনী মুখ না ফিরাইয়াই মাথা নাড়িল।

মালিনী : না, সবাই আমাকে মালিনী ব'লে ডাকে।—আমার কেউ নেই কি-না।···গুরুবারে গুরুবারে আমি রাজবাড়ীতে যাই, রাণী ভানুমতীকে ফুল যোগাতে। রাণী ভানুমতী আমাকে খু—ব ভালবাসেন।—সবাই আমাকে ভালবাসে।—আমার কেউ নেই কি-না—

কালিদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুনিতেছিলেন ; হঠাৎ মালিনী মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল—

মালিনী : তুমি কে?

কালিদাস একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—

কালিদাস : আমার নাম কালিদাস।

মালিনী পরিতুষ্ট ভাবে ঘাড় নাড়িল।

মালিনী : বেশ নাম।—তুমি কি কাজ কর?

কালিদাস একটু চিন্তা করিলেন।

কালিদাস : কাজ ?…আমিও মালা গাঁথি—

উজ্জ্বল চক্ষে মালিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মালিনী : ও মা সত্যি !—কিন্তু—কিন্তু তোমার গলায পৈতে রয়েছে ; তুমি তো মালাকর নও !

কালিদাস মৃদু হাসিলেন।

কালিদাস : আমি—কথার মালাকর।—কবি।

চিবুকে একটি অঙ্গুলি ঠেকাইয়া মালিনী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ; তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলিল—

মালিনী : কবি ! তুমি গান বাঁধতে পার ?

কালিদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। মালিনীর চক্ষু বিস্ময়ে আরও বর্ত্তুলাকার হইল।

মালিনী : তবে, তবে তুমি এখানে কুঁড়ে-ঘর বেঁধেছ যে ! রাজসভায় যাও না কেন ? রাজা কবিদের ভারি ভালবাসেন ; তাদের কত সোনাদানা দেন, থাকবার বাড়ী দেন—

কালিদাসের মুখে ঈষৎ তিক্ততার আভাস খেলিয়া গেল. তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

কালিদাস : রাজারাণীর সোনাদানা আমার দরকার নেই। নিজের হাতে তৈরি এই কুঁড়েই আমার অট্টালিকা—

মালিনী একটুক্ষণ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল ; তারপর আবার আল্পনা দিতে দিতে সদয় কণ্ঠে বলিল—

মালিনী : বুঝেছি ; তুমি রাজারাণীদের সঙ্গে কখনও মেশোনি কি না, তাই ভয় করছে। ভয় পেও না ; ওরা খুব ভাল লোক হয়। আমার রাণী ভানুমতী—খুব ভাল লোক—আর কী সুন্দর ! চোখ ফেরানো যায় না—

কালিদাস মৃদু হাসিলেন

কালিদাস : তুমিও তো ভাল লোক ; জানাশোনা নেই, তবু আমার কত কাজ ক'রে দিচ্ছ। আর দেখতেও সুন্দর—যেন প্রতিমাটি। তবে তোমাকে ফেলে রাজরাণীর পিছনে ছোটবার দরকার কি ?

আহ্লাদে বিগলিত হইয়া মালিনী কবির দিকে ফিরিল , মুখেচোখে সলজ্জ আনন্দ ; কিন্তু তাহা গোপন করিবার চেষ্টা নাই।

মালিনী : আমি সুন্দর ! যাঃ—! (হাসিযা উঠিল) তুমি কবি কি না, তাই মিছিমিছি বলছ।—এবার গ্যাখো দেখি, কেমন আলপনা হযেছে।

কবি সহজ কৃতজ্ঞতায় বলিলেন—

কালিদাস : ভাল হয়েছে, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হয়েছে। নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে ; সে গৃহদেবতা।

মালিনী মাথা হেলাইয়া কিছুক্ষণ কবির পানে চাহিয়া রহিল ; এধরণের কথাবার্ত্তার সহিত সে পরিচিত নয়। পরে একটু হাসিল।

মালিনী : তোমার কথার মানে বুঝেছি। শুনতে হেঁয়ালির মত লাগে, কিন্তু ভাবলে মানে পাওয়া যায়।—আচ্ছা, সব কবিই কি হেঁয়ালির ছন্দে কথা বলেন ?

কালিদাস হাসিয়া উঠিলেন।

কালিদাস। স—ব।

ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব সিপ্রার পরপারে অস্তচূড়া স্পর্শ করিয়াছিলেন : এখন নগর হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। মালিনী চকিতে দিগন্তের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—

মালিনী : ওমা, কি হবে! সূয্যি যে পাটে বসলেন!—আজকেই আমি মরেছি ; রাণীমার ফুল যোগান দিতে দেরী হয়ে যাবে। দাও দাও, আমি চললুম—

কালিদাসের হাতে ভাঁড় ধরাইয়া দিয়া ও সাজিটি প্রায় কাড়িয়া লইয়া মালিনী ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে একবার পিছু ফিরিয়া বলিল—

মালিনী : আবার যেদিন আসব তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব।

কালিদাস স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।
তার পর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবে বলিলেন—

কালিদাস : মালিনী ! যেন সাক্ষাৎ মালিনী ছন্দ !—চপল-চরণ-ছন্দা—নন্দিনী—পুষ্পগন্ধা—

ডিজল্‌ভ্‌ ।

অবন্তীর বিশাল রাজপুরী : প্রাকারবেষ্টিত একটি নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিস্তৃত বিহারভূমির উপর কুঞ্জবাটিকা, উপবন, মধ্যে মধ্যে এক একটি অট্টালিকা : কোনটি মন্ত্রগৃহ, কোনটি শস্ত্রাগার, কোনটি যন্ত্র ভবন—এইরূপ আরও অনেক।

পুরভূমির সর্ব্ব পশ্চাতে মহাদেবী ভানুমতীর অবরোধ—নগরের ভিতর ক্ষুদ্র নগর। অবরোধের ভূভাগ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ; প্রাচীরের কোল ঘেঁষিয়া সঙ্কীর্ণ পরিখা। এখানে প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার ; তাহাও এত সঙ্কীর্ণ যে দুইজন পাশাপাশি প্রবেশ করিতে পারে না।

যে-সময়ের কাহিনী সে-সময়ে রাজপুরীর মহিলাদের প্রাকার-পরিখার অন্তরালে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশে হূণ বর্ব্বরদের উৎপাত হইয়াছিল, সেই সময় পুরন্ধ্রীদের সম্ভ্রম রক্ষার মানসে "হূণহরিণকেশরী" মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অবরোধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারপর হূণ উৎপাত দূর হইয়াছিল ; কিন্তু প্রথা একব্বার গড়িয়া উঠিলে সহজে ভাঙিতে চায় না। অবরোধ ও তৎসংক্রান্ত বিধি রহিয়া গিয়াছিল।

একজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। রক্ষীর বয়স কম, উনিশ-কুড়ি ; কিন্তু ভারী যোয়ান। হাতের লৌহশূল

ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে দ্বারের সম্মুখে পদচারণ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই। দ্বারপথে অবরোধের প্রাসাদভূমির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ; বাহিরে বকুল তমাল পিয়াল শোভিত মুক্ত ভূমি জনশূন্য। সন্ধ্যা সমাগত।

দূরে মালিনীকে আসিতে দেখিয়া রক্ষী থমকিয়া দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর একটু গদগদ হাসি তাহার মুখে দেখা দিল। মালিনীর প্রতি তাহার মনে যে বেশ প্রীতির ভাব আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মালিনী কিন্তু তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাড়াতাড়ি দ্বার প্রবেশের উদ্যোগ করিল। রক্ষী এজন্য প্রস্তুত ছিল, মালিনীর অবজ্ঞা তাহার পক্ষে নূতন নয় ; তাহার বল্লম অর্গলের মত পড়িয়া মালিনীর পথ রোধ করিয়া দিল।

চমকিয়া মালিনী অধীর রুষ্ট মুখে রক্ষীর পানে তাকাইল।

মালিনী : কি হচ্ছে !—পথ ছেড়ে দাও।

মালিনীর ভ্রূকুটি দেখিয়া রক্ষী ঘাবড়াইয়া গেল। সে নূতন প্রেম করিতে
শিখিতেছে, এখনও আনাড়ী, অথচ একটু রসিকতা না করিয়াও
মালিনীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাই
বোকার মত হাসিয়া বলিল—

রক্ষী : বিনা প্রশ্নে তোমাকে রাণীর মহলে ঢুকতে দিই কি বলে ? কঞ্চুকী মশায়ের হুকুম—

মালিনী : ঢের হয়েছে, এবার বল্লম নামাও। আমার দেরি হয়ে গেছে—

রক্ষী : কঞ্চুকী মশায়ের হুকুম—পুরুষ ঢুকতে দেবে না। এখন তুমি যে মেয়ের ছদ্মবেশে পুরুষ নও—

মালিনী : আবার।—আচ্ছা বেশ, বঙ্গই কর তা হ'লে।

মালিনী অদূরস্থ বেদীর আকারের ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর সাজি কোলে লইয়া বসিল, আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া নীরস কণ্ঠে বলিল—

মালিনী : আমার কি! রাণীমা'র এতক্ষণ চুল-বাঁধা গা-ধোয়া হয়ে গেছে—ফুল আর মালার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছেন। বেশ তো, বসে থাকুন। যত দেরি হবে ততই তাঁর রাগ বাড়বে। তা আমি কি করব?—আমাকে যখন তলব হবে, আমি বল্‌ব—

রক্ষী এবার রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। ত্বরিতে দ্বার হইতে বল্লম সরাইয়া মিনতির কণ্ঠে বলিল—

রক্ষী : না না, মালিনী, আমি কি তোমাকে আট্‌কেছি? আমি একটু—ইয়ে—রস করছিলুম। নাও—তুমি ভেতরে যাও—

মালিনী উঠিল না; মুখ কঠিন করিয়া বলিল—

মালিনী : আগে নিজের হাতে কান মলো।

রক্ষীর বয়স অল্প, তাহার কান দুটি রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

রক্ষী : আচ্ছা, এই নাও—মলছি।—কিন্তু এ শুধু তোমাকে —ইয়ে—ভালবাসি বলে—

মালিনী ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; গ্রীবার একটি লীলায়িত ভঙ্গী করিয়া বলিল—

মালিনী : উঃ—! ভালবাসা !

সহসা গম্ভীর হইয়া মালিনী প্রশ্ন করিল—

মালিনী : জানো, নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে ? সে গৃহদেবতা। জানো ?

রক্ষী অবোধের মত ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ঘাড় চুলকাইল।

রক্ষী : কই, না তো।

মালিনী : তবে তুমি কিচ্ছু জানো না।

মালিনী সদর্পে দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া ভিতরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ডিজল্‌ভ্‌।

মহাদেবী ভানুমতীর মহল। প্রসাধন-কক্ষের একটি শিঙার-বেদিকার উপর অপরূপ রূপবতী প্রগাঢ়-যৌবনা রাণী অর্দ্ধশয়ানভাবে অবস্থান করিতেছেন। চারি-পাঁচটি কিঙ্করী তাঁহা ঘিরিয়া আছে। একজন ভানুমতীর আলুলায়িত কুন্তল দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত করিতেছে। দ্বিতীয়া পদপ্রান্তে নতজানু বসিয়া লাক্ষারসে চরণপ্রান্ত রঞ্জিত করিতেছে। অবশিষ্ট কিঙ্করীরা প্রসাধনদ্রব্য হাতে লইয়া সাহায্য করিতেছে।

দ্রুত ব্যস্তপদে মালিনী প্রবেশ করিল ; বাক্যব্যয় না করিয়া ভানুমতীর দেহ পুষ্পাভরণে সাজাইতে লাগিয়া গেল। রাণী মদালসনেত্র মালিনীর দিকে ফিরাইয়া একটু হাসিলেন।

ভানুমতী : আমার কচি মালিনী মেয়ের আজ এত দেরি যে !

মালিনী ক্ষিপ্রহস্তে ভানুমতীর মৃণাল-ভুজে ফুলের অঙ্গদ বাঁধিতে বাঁধিতে হ্রস্বকণ্ঠে বলিতে লাগিল—

মালিনী : কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলুম—দেরি হয়ে গেল রাণি-মা। ফুল নিয়ে নদীর ধার দিয়ে আসছি, চোখ তুলে দেখি—ওমা, এক কবি ! বল তো রাণিমা, অবাক কাণ্ড না ?

রাণী অধরপ্রান্ত একটু কুঞ্চিত করিলেন।

ভানুমতী : এ আর অবাক কাণ্ড কী ! মহারাজের প্রসাদে উজ্জয়িনীতে এত কবি জুটেছে যে বর্ষাকালে ইন্দ্রগোপ কীটও এত জন্মায় না।

মালিনী : ওমা না গো না, এ তোমার ন্যাড়ামাথা নাকলম্বা চিম্‌সে কবি নয়।—কি বলব তোমায় রাণিমা, চেহারা যেন ঠিক—কুমার কার্ত্তিক ! গায়ের রঙ্‌ ডালিম ফেটে পড়ছে—কী নাক, কী চোখ ! বয়স কতই বা হবে ? বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ।

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া ভানুমতী মালিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন।

ভানুমতী : হুঁ ?

মালিনী উৎসাহভরে বলিয়া চলিল—

মালিনী : হ্যাঁ গো রাণিমা। বললে বিশ্বাস করবে না, এত সুন্দর কবি আমি জন্মে দেখিনি।—নদীর পাড়ে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছে, সেইখানেই থাকবে। (সহসা হাসিয়া উঠিয়া) দরজায় আল্‌পনা দিচ্ছিল—কিবা আল্‌পনার ছিরি! হাত থেকে পিটুলির ভাঁড় কেড়ে নিযে আমি আল্‌পনা এঁকে দিলুম। তাই না এত দেরি হ'ল। কবির নাম—কালিদাস। বেশ মিষ্টি নাম, না? আর তেমনি মিষ্টি কি কথা,—কথা শুনলে কান জুড়িযে যায—

ভানুমতী মন দিয়া শুনিতেছিলেন; তাঁহার মুখের গূঢ় হাসি গভীর হইতেছিল। মালিনী থামিতেই তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

ভানুমতী : সত্যি?—নদীর ধারে খাসা কবি কুড়িযে পেযেছিস তো! তা—কি বল্‌লে তোর কবিটি? কানের কাছে ভোমরার মত গুনগুন ক'রে গান শুনিয়েছে বুঝি?

মালিনী রাণীর কথার ব্যঙ্গার্থ বুঝিল না; সে এখনও অতশত বুঝিতে শেখে নাই, সরলভাবে বলিল—

মালিনী : না রাণিমা, গান করেনি, শুধু কথা কয়েছে।—কিন্তু কী মিষ্টি কথা, ঠিক যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে—

ভানুমতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া কিঙ্করীদের মুখের পানে চাহিলেন ;
তাহারাও মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। রাণী অলসহস্তে মালি-
নীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া তাহার কচি মুখখানি দেখিলেন,
তারপর তরল কৌতুকের স্বরে বলিলেন—

ভানুমতী : আমার মালিনী-কুঁড়িটি এতদিনে সত্যিই ফুট্‌বে-ফুট্‌বে করছে—ভোমরাও ঠিক এসে জুটেছে। দেখিস মালিনী, তুই যেমন ভালমানুষ, তোর কবি-ভোমরা সব মধুটুকু শুষে নিয়ে উড়ে না পালায়—

কিঙ্করীরা হাসিতে লাগিল। মালিনী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া অবাক
হইয়া সকলের মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। রাণী হাসিতে
হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মালিনীর দুই স্কন্ধের উপর
হাত রাখিলেন, স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : বোকা মেয়ে! এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি।—ভয় নেই, একদিন ঘুম ভাঙ্গবে; হঠাৎ সব বুঝতে পারবি।—তোর কবি বুঝি ঘুম ভাঙ্গাতেই এসেছে!

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

প্রভাত। কালিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণ। বেদীর উপর কবি বসিয়া আছেন ; সম্মুখে মৃত্তিকার মসীপাত্র, খাগের কলম ও একতাড়া তালপত্র। কবি রচনায় নিমগ্ন ; কিন্তু যত না রচনা করিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন তাহার দশগুণ। ললাট

চিন্তা-চিহ্নিত ; কোথাও যেন আটকাইয়া গিয়াছে। কবি কয়েকবার মুখে বিড়্বিড়্ করিতে করিতে করাগ্রে গণনা করিলেন ; তারপর অন্যমনস্কভাবে লেখনী মসীপাত্রে ডুবাইলেন। কিন্তু মনে মনে যাহা গড়িয়াছিলেন তাহা মনঃপূত হইল না, তিনি আবার কলম রাখিয়া দিলেন। তালপত্রে একটি অসমাপ্ত শ্লোক লেখা ছিল ; তালপত্রটি তুলিয়া লইয়া জানুর উপর রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—যেন উহার ধ্বনি হইতে পরবর্ত্তী অলিখিত পংক্তির ইঙ্গিত ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কালিদাস :—অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা—ভবানী !

শেষ শব্দটি তিনি সংশয়সঙ্কুল কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—'ভবানী' শব্দটি পত্রে লেখা ছিল না, কবি পাদপূরণের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন—

কালিদাস : উঁহু—ভবানী চলবে না ; এখনও তো দেবী ভবানী হননি। কৃশাঙ্গী—? উঁহু···মৃগাক্ষী···উঁহু উঁহু—

কবির ভাবাবিষ্ট চক্ষু এদিকে ওদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে গিয়া সহসা রুদ্ধ হইল ; কবি ভাবতন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। প্রাঙ্গণের দ্বারপথে হাসিতে হাসিতে মালিনী প্রবেশ করিতেছে। সদ্যঃস্নাতা ; হাতে তাম্রের থালিতে একরাশ ফুল ; মাথার সিক্ত চুলগুলি বুকে-অংসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের শিশিরবিন্দুর মত চৌদিকে আনন্দের রশ্মি বিকীরণ করিতে করিতে মালিনী কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস চকিত বিস্ফারিত নেত্রে

ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। এ কি! এ যে গিরিকন্যারই মর্ত্ত্য-প্রতিমূর্ত্তি! যে শব্দটির অভাবে তাঁহার শ্লোক এবং কাব্যের প্রথম স্বর্গ সমাপ্ত হইতেছে না সেই শব্দটি বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত তাঁহার মস্তিষ্কে জ্বলিয়া উঠিল। ত্বরিতে লেখনী ধরিয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। (সেকালে মুষ্টিতে লেখনী ধরিয়া লিখিবার রীতি ছিল) খস্ খস্ করিয়া তালপত্রের উপর কলম চলিতে লাগিল।

ফুলের থালি হাতে মালিনী বেদীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কবি অন্যদিনের মত তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন না, মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। মালিনীর হাসিভরা মুখখানি ম্লান হইয়া গেল; অভিমানে চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। কবি ব্যগ্রভাবে লিখিয়া চলিলেন, যেন মুহূর্ত্তের জন্য অন্যদিকে মন দিলেই শব্দগুলা মস্তিষ্কের পিঞ্জর খুলিয়া উড়িয়া যাইবে। মালিনী ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় বলিল—

মালিনী: এত কাজ—আমার পানে চোখ তুলে চাইবারও সময় নেই! বেশ।—

কালিদাস মুখ না তুলিয়াই চাপা সুরে বলিলেন—

কালিদাস: স্‌স্‌—একটু দেরি কর···এটা শেষ ক'রে ফেলি···(লিখিতে লিখিতে) নিযমিত পরি···

মুখে অসমাপ্ত কথা মিলাইয়া গেল, কবি লিখিয়া চলিলেন। ক্রমে লেখা শেষ হইল। লেখার নীচে কলমের একটি সাড়ম্বর আঁচড় টানিয়া কালিদাস হাস্যোজ্জ্বল মুখে মালিনীর পানে চাহিলেন।

কালিদাস: ব্যাস—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ।—

মালিনী মুখভার করিয়া রহিল; কালিদাস সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন—

কালিদাস : একটা শব্দ কিছুতেই মাথায় আসছিল না ; তোমাকে দেখেই মনে পড়ে গেল—তোমার ঐ কালো কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দেখে—

মালিনীর পক্ষে আর অভিমান করিয়া থাকা সম্ভব হইল না , কৌতূহলী দীপ্ত চোখে সে কালিদাসের পানে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—

মালিনী : কী কথা ?—বল না !

কালিদাস : কথাটি হচ্চে—সুকেশী। তোমার সুন্দর ভিজে চুলগুলি দেখে মনে পড়ে গেল।

মালিনী বেদীর একপাশে বসিয়া পড়িল। কৌতূহলের সীমা নাই। ফুলের পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া সে এক অঞ্জলি ফুল কবির কোলের উপর ঢালিয়া দিল ; তারপর লেখনী মসীপাত্র তালপত্রের উপর দুই চারিটি ফুল ছড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—

মালিনী : কিসের গান লিখছ বল না ? শিবের গীত বুঝি ?

কালিদাস : হ্যাঁ। শিব আর পার্ব্বতীর গল্প। শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর তখনও বিয়ে হয়নি। শিব তপস্যা করছেন—কঠিন তপস্যা ; আর গিরিকন্যা উমা রোজ এসে তাঁর সেবা করেন—ফুল সমিধ আহরণ করে এনে দেন, পূজার জন্যে বেদী মার্জ্জন করে দেন।—তারপর এইসব কাজ ক'রে যখন ক্লান্ত হযে পড়েন, তখন শিবের ললাট—চন্দ্রের কিরণের তলায় বসে ক্লান্তি দূর করেন—শুনবে শেষ শ্লোকটা—

মালিনী অবহিত চিত্তে শুনিতেছিল ; কেবল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িল।

কালিদাস তালপত্র তুলিয়া লইয়া পড়িলেন—

কালিদাস :—অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরব। কালিদাস ধীরে ধীরে তালপত্রটি নামাইয়া রাখিলেন, মালিনীর দিকে মৃদু সস্নেহ হাসিয়া বলিলেন—

কালিদাস : এ ছন্দের নাম জানো ?

মালিনী : না। কী ?

কালিদাস : মালিনী ছন্দ—তোমার নামের ছন্দ।—প্রত্যেক সর্গের শেষে একটি করে তোমার নামের ছন্দের শ্লোক লিখব ঠিক করেছি। আমার কাব্য যদি বেঁচে থাকে মালিনীর নামও কেউ ভুলবে না ; আমার কাব্যে তোমার নাম গাঁথা থাকবে।

মালিনীর মুখ লজ্জায় আনন্দে গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালিদাস হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরম বিলাসভরে আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে অঙ্গন-বেষ্টনীর বাহিরে সিপ্রার তীরে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার হাস্য-আলস্য-ভরা মুখে সহসা ভাবান্তর দেখা গেল।

কালিদাস

শিপ্রার তীররেখা ধরিয়া একশ্রেণী উট চলিয়াছে। আর একদিনের কথা কালিদাসের মনে পড়িয়া গেল—পূর্ণিমার নিথর রাত্রি, জ্যোৎস্না প্লাবিত রাজোদ্যান, পার্শ্বে স্ফুটযৌবনা রাজকুমারী, প্রাকার বেষ্টনীর পরপারে এক সারি উট চলিয়াছে, তারপর…

স্মৃতির বেদনা কালিদাসের মুখে করুণ ছায়াপাত করিল। মালিনী ঊর্দ্ধমুখী হইয়া কালিদাসের পানে চাহিয়া ছিল, সে তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। ঈষৎ বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে প্রাঙ্গণ-বেষ্টনীর ওপারে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। তখন সেও বেদীর উপর উঠিতে উঠিতে বলিল—

মালিনী : কি দেখছ ?

কালিদাস উত্তর দিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। মালিনী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া দেখিল—উটের সারি। সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—

মালিনী : আ কপাল—উট। আমি বলি, না জানি কী! (কবির দিকে ফিরিয়া) বলি হ্যাগা কবি, উট দেখে তোমার ভয় হ'ল না কি ?

কালিদাস ম্লান হাসিলেন—

কালিদাস : ভয় নয় মালিনী, দুঃখ হ'ল। ঐ উটের সঙ্গে একটা বড় দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

কালিদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। মালিনী সপ্রশ্ন নেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু কবি আর কিছু বলিলেন না।

কালিদাস

ডিজলভ্ ।

অবন্তীর রাজসভা। কুন্তল রাজসভার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এ আরও
বৃহৎ ব্যাপার। উপরন্তু অবরোধের মহিলাগণের জন্য
প্রাচীরগাত্রে প্রেক্ষামঞ্চের ব্যবস্থা আছে।

মধ্যাহ্ন কাল। প্রধান বেদিকার উপর মহারাজ বিক্রমাদিত্য আসীন। পঁয়ত্রিশ বৎসরের দৃপ্তকায় পুরুষ; দণ্ডমুকুটাদির আড়ম্বর নাই, তিনি বেদীর মার্জ্জিত কুট্টিমের উপর কেবল মাত্র একটি স্থূল উপাধান আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধশয়ান ছিলেন। চারিপাশে কয়েকটি অন্তরঙ্গ সভাসদ নিকটে দূরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। বরাহমিহির ও অমরসিংহ একত্র বসিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছিলেন। একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিত চিকুর কবি দন্তহীন মুখ রোমন্থনের ভঙ্গীতে নাড়িতে নাড়িতে একাগ্র মনে শ্লোক রচনা করিতেছিলেন। প্রবীণ মহামন্ত্রী একপাশে বসিয়া পারাবতপুচ্ছের সাহায্যে কর্ণকুহর কণ্ডুয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার অনতিদূর পশ্চাতে স্থূলকায় বিদূষক চিৎ হইয়া উদর উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল।

মহারাজের শিয়রের কাছে বসিয়া এক তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী যুবতী একমনে তাম্বুল রচনা করিয়া সোনার থালে রাখিতেছিল। আর একটি যবনী সুন্দরী শীতল ফলাম্লরসের ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া চিত্রার্পিতার মত একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরের আলস্য সকলকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। মহারাজ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ একটা রসের কথা পর্য্যন্ত বলিতেছিল না। সভাটা যেন নিতান্ত ব্যাজার হইযাই শেষ পর্য্যন্ত ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বরাহমিহির ও অমরসিংহের মৃদু জল্পনা ঝিল্লিগুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল।

বরাহমিহির প্রকাণ্ড একটি হাই তুলিয়া হস্তদ্বারা উহা চাপা দিলেন ;
তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

বরাহমিহির : রবি এবার মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন।—

বিক্রমাদিত্য একটু উৎসুকভাবে সেইদিকে তাকাইলেন।

বিক্রমাদিত্য : কী বললেন মিহির ভট্ট ?

বরাহমিহির : আমি বলছিলাম মহারাজ যে, রবি এবার মকর রাশিতে গিয়ে ঢুকবেন।

মহারাজ আবার উপাধানে হেলান দিয়া বসিলেন ; ব্যঙ্গ-বঙ্কিম
মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : হুঁ—ঢুকবেন তো এত দেরি করছেন কেন ? তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেই পারেন। আমার তো এই আলস্য আর নৈষ্কর্ম্ম্য অসহ্য হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে কেউ যেন কিছু করছে না, কেবল বসে বসে ঝিমচ্ছে। ইচ্ছে করে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে আবার যুদ্ধযাত্রা করি। তবু তো একটা কিছু করা হবে !

মহামন্ত্রী কর্ণকণ্ডুয়নে ক্ষণকাল বিরতি দিয়া মিটি-মিটি হাস্য করিলেন,
গূঢ় পরিহাসের কণ্ঠে বলিলেন—

মহামন্ত্রী : কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন মহারাজ ?—শত্রু তো একটিও অবশিষ্ট নেই।

বিরক্তি সত্ত্বেও মহারাজের মুখে হাসি ফুটিল।

বিক্রমাদিত্য : তাও বটে। বড় ভুল হয়ে গেছে, মন্ত্রি! সবগুলো শত্রুকে একেবারে বিনাশ ক'রে ফেলা উচিত হয়নি। অন্তত দু-একটাকে এই রকম দুর্দ্দিনের জন্য রাখা উচিত ছিল।

এই সময় রচনা-রত কবি গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন ; তাঁহার রচনা শেষ হইয়াছে। রাজা তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

বিক্রমাদিত্য : কী হয়েছে কবি, আপনি ওরকম করছেন কেন? হাতে ওটা কি?

গলা পরিষ্কার করিয়া কবি বলিলেন।

কবি। শ্লোক, মহারাজ। আপনার একটি প্রশস্তি রচনা করেছি—

বিক্রমাদিত্য নিরুপায়ভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন ; তারপর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : হুঁ। বেশ পড়ুন—শুনি।

মহারাজের প্রশস্তি-পাঠ হইতেছে, সুতরাং অন্য সকলেও সেদিকে মন দিল। কবি শ্লোক পাঠ করিলেন—

কবি : শত্রূণাং অস্থিমুণ্ডানাং শুভ্রতাং উপহাস্যতী
হে রাজন্ তে যশোভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ ॥

কালিদাস

সকলে অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল অমরসিংহ
ভ্রূকুটি করিয়া কবির দিকে তাকাইলেন বোধ হয়
শব্দপ্রয়োগে কিছু ভুল হইয়া থাকিবে।

এই জাতীয় শুষ্ক কবিত্বহীন প্রশস্তি শুনিতে শুনিতে রাজার কর্ণজ্বর উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তবু কবির প্রাণে আঘাত দিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। অথচ সাধুবাদ করাও চলে না। রাজা বিপন্নভাবে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী এই সময় তাম্বূলপূর্ণ থালি রাজার সম্মুখে ধরিল।
রাজা চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন; মৃদুস্বরে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: মদনমঞ্জরী, তুমিই এই কবিতার বিচারক হও। একে কবিতা বলা চলে? মোট কথা, কবিকে পান দেওয়া যেতে পারে কি না?

মদনমঞ্জরী অতি অল্প হাস্য করিল, তাহার অধর একটু নড়িল।

মদনমঞ্জরী: পারে মহারাজ।—কারণ কবিতা যেমনই হোক, তাতে আপনার গুণগান করা হয়েছে—

মহারাজ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর একটি পান লইয়া
মুখে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: (মৃদুস্বরে) ভাল, তোমার বিচারই শিরোধার্য্য। (উচ্চস্বরে) তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, কবিকে তাম্বুল উপহার দাও, তাঁর কবিতা শুনে আমরা প্রীত হয়েছি।

মদনমঞ্জরী উঠিয়া গিয়া তাম্বূলের থালি কবির সম্মুখে ধরিল। কবি লুব্ধ-হস্তে একটি পান তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিলেন।

বিক্রমাদিত্য সদয়কণ্ঠে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : কবি, আজ আপনার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে ; এবার গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

কবি : জয়োস্তু মহারাজ—

কবি রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিক্রমাদিত্য আর একবার উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্য : আমার বয়স্যটি কোথায়, কেউ বলতে পার ?

মহামন্ত্রী পশ্চাদ্দিকে একটি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রী : এই যে এখানে মহারাজ, অকাতরে ঘুমচ্ছে।

মহারাজ আবার উঠিয়া বসিলেন।

বিক্রমাদিত্য : ঘুমচ্ছে। আমরা সকলে জেগে আছি—অন্তত জেগে থাকবার চেষ্টা করছি—আর পাষণ্ড ঘুমচ্ছে।—তুলে দাও মন্ত্রী।—

আদেশ পাইবামাত্র মন্ত্রী নিজের পারাবত পুচ্ছটি বিদূষকের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইয়া পাক দিলেন। বিদূষক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিদূষক : আরে রে মন্ত্রি-শাবক ! মহারাজ, আপনার এই অল্পায়ু অস্থিচর্ম্মসার মন্ত্রীটা আমার নাকে বিষ প্রয়োগ করেছে।

মন্ত্রীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পূর্ব্ববৎ কানে কাঠি দিতেছেন ; রাজা গম্ভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য ঃ বয়স্য, রাজসভায় তুমি ঘুমচ্ছিলে ?

বিদূষক কটমট করিয়া মন্ত্রীর পানে তাকাইল।

বিদূষক ঃ কে বলে ঘুমচ্ছিলাম—কোন উচ্চিটিঙ্গ বলে ? মহারাজ, আমি মনে মনে আপনার প্রশস্তি রচনা করছিলাম।

মহারাজের অধর-কোণে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি পুনশ্চ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য ঃ প্রশস্তি রচনা করছিলে ? বটে ! ভাল—শোনাও তোমার প্রশস্তি। কিন্তু মনে থাকে যেন, যে প্রশস্তি আমরা এখনি শুনেছি, তার চেয়ে যদি ভাল না হয়—তোমাকে শূলে যেতে হবে।

বিদূষক ঃ তথাস্তু।

বিদূষক আসিযা মহারাজের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিল।

বিদ্‌ষক ঃ শ্রূয়তাং মহারাজ—

তাম্বুলং যৎ চর্ব্বয়ামি সর্ব্বং তে রিপু মুণ্ডবঃ

পিক্ ত্যজামি পুচুৎ কৃত্বা তদেব শত্রুশোণিতম্।

প্রাকৃত ভাষায় অস্যার্থ হচ্চে—আমরা যে পান খাই, তা সর্ব্বৈব মহারাজের শত্রুদের মুণ্ডু ; আর পুচ্ করে যে পিক্ ফেলি তা নিছক শত্রুশোণিত !

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই বিদূষক স্বর্ণ থালি হইতে এক খাম্‌চা পান তুলিয়া মুখে পুরিল এবং সাড়ম্বরে চিবাইতে লাগিল। মহারাজ হাসিলেন। অন্য সকলেও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন।

কালিদাস

ডিজল্‌ভ্‌।

কালিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের বেষ্টনীতে লতা
উঠিয়াছে। লতায় ফুল ধরিয়াছে।

কালিদাস গৃহে নাই। মালিনী পরম স্নেহভরে আচল দিয়া কবির বেদিকাটি মুছিয়া দিতেছে। মার্জ্জন শেষ হইলে সে কুটীরে প্রবেশ করিয়া কবির পুঁথি লেখনী মসীপাত্র লইয়া আসিল, সযত্নে সেগুলি বেদীর উপর সাজাইয়া রাখিল। তারপর ফুল দিয়া বেদীর চারিপাশ সাজাইল। অবশেষে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণদ্বারের পানে উৎসুক নেত্রে তাকাইল।

মালিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকে না যে, সে মরিয়াছে। প্রাঙ্গণদ্বার দিয়া কালিদাস স্মিতমুখে সিক্ত-বস্ত্র নিঙ্‌ড়াইতে নিঙ্‌ড়াইতে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূজা ও স্নানের জন্য সিপ্রার তীরে গিয়াছিলেন।

মালিনী: আসা হ'ল? বাবাঃ, পূজো আর স্নান যেন শেষই হয় না।—নাও, বোসো। কি হচ্ছিল এতক্ষণ?

কালিদাস ভালমানুষটির মত বেদীর উপর বসিলেন; মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

কালিদাস: পূজো আর স্নান।

মালিনী কবির হাত হইতে সিক্ত বস্ত্রটি লইয়া নিজের কাঁধের উপর
ফেলিল; তারপর এক রেকাবি ফল লইয়া কালিদাসের
কোলের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল—

মালিনী: আচ্ছা, এবার এগুলো মুখে দেওয়া হোক—

কালিদাস ফলগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন।

কালিদাস: এ কোথা থেকে এল?

মালিনী : এল কোথাও থেকে। সে খোঁজে তোমার দরকার ?

কালিদাস : (মৃদুহাস্যে) আমার ভাণ্ডারে তো যত দূর মনে পড়ছে—

মালিনী : চারটি আতপ চাল আর দুটি ঝিঙে ছাড়া কিছু নেই।—আচ্ছা, খাবার সামিগ্রি ঘরে এনে রাখতে মনে না থাকে, আমাকে বল না কেন ?—দুপুরবেলা না হয় দুটি ভাত ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে—বামুন মানুষের কথাই আলাদা, কিন্তু সকালে স্নান-আহ্নিক ক'রে কিছু মুখে দিতে হয় না ? দুটো বাতাসা কি একছড়া কলাও ঘরে রাখতে নেই ?

কালিদাস : ভুল হয়ে যায় মালিনী।

মালিনী : ভুল—সব তাতেই ভুল। এমন মানুষও দেখিনি কখনও—খাবার কথা ভুল হয়ে যায়।

কালিদাস : ঐ তো মালিনী, কবি জাতটাই ঐরকম। পৃথিবীতে যে-কাজ সবচেয়ে দরকারি তাতেই তাদের ভুল হয়ে যায়। আমার এক তুমিই ভরসা।

অনির্ব্বচনীয় প্রীতিতে মালিনীর মুখ ভরিয়া উঠিল। তবু সে তিরস্কারের ভঙ্গীতেই বলিল—

মালিনী : আচ্ছা হয়েছে, এবার খাওয়া হোক।—মনে থাকে যেন, গল্প যে-পর্য্যন্ত শুনেছি তার পর থেকে পড়ে শোনাতে হবে—

মালিনী সিক্তবস্ত্রটি বেড়ার উপর শুকাইতে দিতে গেল ; কালিদাস প্রীতমুখে আহারে মন দিলেন

কালিদাস

ওয়াইপ্

আহার শেষ করিয়া কালিদাস সম্মুখে রক্ষিত পুঁথিখানি তুলিয়া লইলেন। মালিনী ইত্যবসরে বেদীর নীচেটিতে আসিয়া বসিয়াছিল এবং বেদীর উপর একটি বাহু রাখিয়া কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া পরম তৃপ্তিভরে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কবি পুঁথির পাতাগুলি সাজাইতে সাজাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

কালিদাস ঃ আচ্ছা শোনো এবার। ইন্দ্রসভা থেকে বিদায় নিয়ে মদন আর বসন্ত হিমালয়ে মহাদেবের তপোবনে উপস্থিত হলেন। অমনি হিমালয়ের বনে উপত্যকায় অকাল-বসন্তের আবির্ভাব হ'ল। শুক্‌নো অশোকের ডালে ফুল ফুটে উঠ্‌ল—আমের মঞ্জরীতে ভোমরা এসে জুট্‌ল—শোনো—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ।—

কালিদাস একটু সুর করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিলেন; মালিনী মুগ্ধ তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দুটি কখনও আবেশভরে মুকুলিত হইয়া আসিল, কখনও বা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; নিশ্বাস কখনও দ্রুত বহিল, কখনও স্তব্ধ হইয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পীর মত দেহ ছন্দের তালে তালে দুলিতে লাগিল। এ কি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি! প্রতি শব্দ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কল্পনার অলৌকিক লীলাবিলাসে, ভাবের অগাধ গম্ভীরতায়, ছন্দের অনাহত মন্দ্র মহিমায় মালিনী আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। এমন গান সে আর কখনও শুনে নাই। মালিনী জানিত না যে এমন গান মানুষ পূর্ব্বে আর কখনও শুনে নাই—সে-ই প্রথম শুনিল।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। তারপর মালিনী গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র কালিদাসের মুখের পানে তুলিল, ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলিল—

মালিনী : কবি, স্বর্গ বুঝি এমনিই হয়?—কোন্ পুণ্যে আমি আজ স্বর্গ চোখে দেখলুম!—না না, আমি এর যোগ্য নই, এ গান আমাকে শোনাবার জন্যে নয়…এ গান রাজাদের জন্যে, দেবতাদের জন্যে—

সহসা মালিনী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

মালিনী : কবি, একটা কথা শুনবে? আমার রাণী-মা'কে তোমার গান শোনাবে?

কালিদাসের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

কালিদাস : মালিনী, রাজা-রাণীদের আমার গান শুনিয়ে কি লাভ? তোমার ভাল লেগেছে, এই যথেষ্ট।

মালিনী : (ব্যাকুলভাবে) না না, কবি—আমার ভাল লাগা কিছু নয়, আমার ভাল লাগা তুচ্ছ। আমি কতটুকু? আমার বুকে আমি—(এইখানে মালিনী দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিল)—এত ভাল-লাগা ধ'রে রাখতে পারি না।—কবি, বলো আমার কথা শুনবে?—রাজাকে শোনাতে না চাও, শুনিও না, কিন্তু রাণীকে তোমার গান শোনাতেই হবে। বলো শোনাবে! আমার রাণী

ভানুমতী—ওগো কবি, তুমি জানো না—তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনিই তোমার গানের মরম বুঝবেন, তিনি তোমার গানে ডুবে যাবেন—

কালিদাসের বিমুখতা ক্রমে দূর হইতেছিল. তবু তিনি আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—

কালিদাস : কিন্তু কাব্য যে এখনও শেষ হয় নি—

মালিনী : তা হোক। যা হয়েছে তাই শোনাবে।

কালিদাস তখন নিরুপায় হইয়া বলিলেন—

কালিদাস : তা—ভাল। রাণী যদি শুনতে চান্—

কালিদাসের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মালিনী সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওয়াইপ্.

রাণী ভানুমতীর মহলে একটি কক্ষ। মেঝের উপর স্থানে স্থানে মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত। একটি গজ দন্তের পালঙ্কের উপর ভানুমতী অর্দ্ধশয়ান রহিয়াছেন। বক্ষের নিচোল কিছু শিথিল ; চুলের ফুল আতপ্ত দ্বিপ্রহরে মুরঝাইয়া পড়িয়াছে। রাণীর কাছে দাসী-কিঙ্করী কেহ নাই, কেবল মালিনী পালঙ্কের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ব্যগ্র হ্রস্ব কণ্ঠে কথা বলিতেছে।

মালিনী : হ্যাঁগো রাণি-মা, সত্যি বলছি তোমাকে, এমন গান তুমিও শোনোনি কখনও! শুনতে শুনতে মনে হয় যেন—যেন—

(মালিনী দুই হাত নাড়িয়া নিজের মনের অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না)—কি বলে বোঝাব তোমাকে ভেবে পাই না।—চোখে জল আসে, বুক ভরে ওঠে—নাঃ বলতে পারছি না। তুমি একবার নিজের কানে শোনো না, রাণি-মা! দেখো তখন, সব ভুলে যাবে, সংসার মনে থাকবে না।

মালিনীর উদ্দীপনা দেখিয়া ভানুমতী একটু হাসিলেন।

ভানুমতীঃ বড় সরলা তুই মালিনী। সংসার ভুলিয়ে দিতে পারে এমন কবি আজকাল আর জন্মায় না। আমি সব আধুনিক কবির গান শুনেছি; তারা সব স্তাবক—চাটুকার; কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে রাজার প্রশস্তি লিখতে জানে—

মালিনীঃ ওগো রাণি-মা, আমার কবি তেমন নয়—সে কারুর খোশামোদ করে না; সে কেবল ঠাকুর-দেবতার গান লেখে। মহাদেব পার্ব্বতী—মদন বসন্ত—এই সব—

ভানুমতী আলস্যজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতীঃ যাই হোক, আমার মালিনীটিকে যে-কবি এমন ক'রে পাগল করেছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

মালিনী উৎসা - আহ্লাদে রাণীর উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল

মালিনীঃ দেখবে তাকে রাণি-মা? দেখবে?

ভানুমতীঃ দেখতে পারি। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব, ভেবে

পাচ্ছি না।—তোর কবি তো রাজসভায় যাবে না—আর আমার মহলে আনা, সেও অসম্ভব।

মালিনী : অসম্ভব কেন হবে রাণি-মা। তোমার হুকুম পেলে আমি সব ঠিক করতে পারি।

ভানুমতী : কী ঠিক করতে পারিস ?

মালিনী : এই—আমার কবি চুপি চুপি মহলে এসে তোমাকে গান শুনিয়ে যাবে—কেউ কিছু জানতে পারবে না। তুমি শুধু তোমার চেড়িদের একটু তফাতে রেখো—আর বাকি যা করবার তা আমি করব।

ভানুমতী উর্দ্ধে চক্ষু তুলিয়া একটু ভ্রূকুটি করিলেন, একটু হাসিলেন ; ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—

ভানুমতী : মন্দ হয় না—নতুন রকমের হয়। আর্য্যপুত্রকে—

এক যবনী প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। নীল চক্ষু, সোনালী চুল, বক্ষে লৌহজালিক। ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ।

প্রতীহারী : দেবপাদ মহারাজ আশ্ছেন—সংগে কঞ্চুকী মহাশয়।

বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া প্রতীহারী অপসৃতা হইল। রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। তাঁহার চোখের ইসারা পাইয়া মালিনী চুপি চুপি ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য প্রবেশ করিলেন ; পশ্চাতে কঞ্চুকী। কঞ্চুকী নপুংসক ;
কৃশকায়, মুণ্ডিতশীর্ষ, কদাকার। চক্ষের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও অসন্তোষ
স্থায়ীভাব ধারণ করিয়াছে ; নিম্ব ভক্ষণের অব্যবহিত পরে
মুখের আকৃতি যেরূপ হয়, কঞ্চুকীর মুখের
সহজ অবস্থাই সেইরূপ

ভানুমতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধহস্তে স্মিতমুখে আর্য্যপুত্রের সম্বর্দ্ধনা
করিলেন ; উভয়ের চোখে-চোখে যে প্রসন্নতার বিনিময় হইল তাহা
হইতে অনুমান হয় যে এই রাজ-দম্পতীর মধ্যে প্রণয়ের
উৎসধারা এখনও মন্দবেগ হয় নাই।

রাণীর দিকে আসিতে আসিতে রাজা একবার পশ্চাদ্দিকে
মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : তুমি এখন যেতে পারো, কঞ্চুকী—

কঞ্চুকী পশ্চাৎ হইতে রাজ-দম্পতীকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া চলিল। দ্বারের
কাছে পৌঁছিয়া সে একবার তাহার সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে
ফিরাইল ; ঘরের কোণে দণ্ডায়মানা মালিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি
পড়িল। ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কঞ্চুকী সেইদিকে তাকাইয়া
রহিল ; তারপর নিঃশব্দে মুণ্ডসঞ্চালন করিয়া তাহাকে কক্ষ
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইঙ্গিত করিল। মালিনী শঙ্কিত
মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া কঞ্চুকীর অনুবর্ত্তিনী হইল।

কক্ষ শূন্য হইয়া গেলে ভানুমতী দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ আলিঙ্গন
করিয়া স্নিগ্ধ কৌতুকের স্বরে বলিলেন—

ভানুমতী : আজ বুঝি আমার সতীন আমার পতিদেবতাকে ধরে রাখতে পারল না ?

মহারাজ স্মিতমুখে ভ্রূ তুলিলেন

বিক্রমাদিত্য : তোমার সতীন। সে আবার কে ?

ভানুমতী : তাকে আপনি চেনেন না, আর্য্যপুত্র ?—পুরুষ জাতি এমনিই কপট।—আমাব সতীনের নাম রাজসভা ; যাকে ছেড়ে আপনি একদণ্ড থাকতে পারেন না।

রাজা ভানুমতীর কুন্তল হইতে একটি ফুল তুলিযা লইয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ভানুমতী বলিযা চলিলেন—

ভানুমতী : —শুনেছি কনিষ্ঠা ভার্য্যার প্রতি পুরুষের অনুরাগ বেশী হয় ; মহারাজের কিন্তু সব বিপরীত—জ্যেষ্ঠার প্রতিই তাঁর আসক্তি প্রবল। রাজ্যশ্রী চির-যৌবনা—তাই বুঝি তাকে এত ভালবাসেন মহারাজ ?

বিক্রমাদিত্যের মুখ হইতে কৌতুকের ছাযা অপসৃত হইল ; তিনি ভানুমতীর মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ গভীর অনুরাগ ভরে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : তা জানি না। রাজ্যশ্রী যদি যায, তবু তুমি আমার বুক জুড়ে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি যাও, আমার চোখে রাজ্যশ্রীর এ সম্মোহন রূপ কি থাকবে ? রাজলক্ষ্মী যে তোমারই ছায়া, ভানুমতী।

বাষ্পাকুল চক্ষে ভানুমতী পতির বক্ষের উপর ললাট রাখিলেন,
গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী: ও কথা বলতে নেই, প্রিয়তম। রাজলক্ষ্মীই প্রধানা, আমি কেউ নই। মহাকাল করুন, রাজলক্ষ্মীর কোলে আপনাকে তুলে দিয়ে যেন যেতে পারি।

কিছুক্ষণ উভয়ে তদবস্থায় রহিলেন

বাহিরে মানমন্দির হইতে দিবা তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল।
রাণীর একজন সখী মঞ্জীর বাজাইয়া কক্ষের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া রাজদম্পতীকে
আশ্লেষবদ্ধ দেখিয়া জিহ্বা কর্তনপূর্বক লঘুচরণে পলায়ন করিল

রাজারাণী পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া পালঙ্কের উপর পাশাপাশি বসিলেন।
ভানুমতী হাসিমুখে বলিলেন—

ভানুমতী: কিন্তু আজ মহারাজ তিন প্রহরের আগেই সভা থেকে পালিয়ে এলেন কেন তা তো বললেন না! সভা-কবিরা কি চিত্ত-বিনোদন করতে পারল না?

বিক্রমাদিত্য মুখের ভাব করুণ করিয়া বলিলেন--

বিক্রমাদিত্য: চিত্ত-বিনোদন! সভা-কবিদের ভয়েই তো তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি ভানুমতী!

হাস্য গোপন করিয়া রাণী কপট-ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : ছি মহারাজ, আপনি বীরকেশরী—আর, কয়েক-জন নির্জ্জীব হংসপুচ্ছধারী কবির ভয়ে পালিয়ে এলেন !

বিক্রমাদিত্য : উপায় কি ! কবি দিঙ্‌নাগ সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি 'কুম্ভকর্ণ-সংহার' নামে কাব্য শেষ করেছেন, আমাকে শোনাবার জন্যে উটের পিঠে কাব্য বোঝাই করে সভায় নিযে আসছেন। শুনে অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বররুচি—যাঁরা সভায় ছিলেন, সকলেই উঠে দ্রুত প্রস্থান করলেন। আমিও আর বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা ক'রে অন্তঃপুরের দিকে চলে এলাম। এখানে অন্তত দিঙ্‌নাগ ঢুকতে পারবে না।

ভানুমতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন

বিক্রমাদিত্য : এবার এস—পাশা খেলা যাক।

ভানুমতী হাস্য সম্বরণ করিয়া ডাকিলেন—

ভানুমতী : সুজাতা ! মধুশ্রী !

দুইটি কিঙ্করী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

ভানুমতী : খেলার আযোজন কর। মহারাজ পাশা খেলবেন।

সখিদ্বয় ত্বরিতে কাজে লাগিয়া গেল। সুজাতা কুট্টিমের মধ্যস্থল হইতে মৃগচর্ম্ম অপসারিত করিতেই মর্ম্মরের উপর অঙ্কিত অক্ষবাট বাহির হইয়া পড়িল। মধুশ্রী দুইটি পক্ষ্মল আসন তাহার দুই পাশে বিছাইয়া দিল, তারপর ঘরের কোণ হইতে গজদন্তের একটি ক্ষুদ্র পেটিকা আনিয়া অক্ষবাটের পাশে রাখিল

রাজা ও রাণী উঠিয়া গিয়া আসনে বসিলেন। রাজা পেটিকাটি অক্ষবাটের উপর উজাড় করিয়া দিয়া পাষ্টি তিনটি হাতে তুলিয়া লইলেন; রাণী রঙীণ গুটিকাগুলি সাজাইতে লাগিলেন

রাজা পাষ্টিগুলি সশব্দে ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন--

বিক্রমাদিত্য : আজ তোমাকে নিশ্চয় হারাব।

তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় রাণীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না। রাণী মুখ টিপিয়া হাসিলেন---

ভানুমতী : ভাল কথা মহারাজ। কিন্তু যদি হেরে যান, কী পণ দেবেন?

বিক্রমাদিত্য : যা চাও। অঙ্গদ কুণ্ডল দণ্ড মুকুট—কিছুতেই আপত্তি নেই।—জয় কৈতব নাথ!

মহারাজ ঘর্ঘর শব্দে পাশা ফেলিলেন। খেলা আরম্ভ হইল।

ওয়াইপ্

খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। আরও কয়েকটি সখী কিঙ্করী আসিয়া জুটিয়াছে এবং চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া সকুতূহলে খেলা দেখিতেছে। রাজার পাশে সুরা ভৃঙ্গার ও পানপাত্র, রাণীর পাশে তাম্বূলকরঙ্ক। দু'জনেই খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন; খেলার মত্ততায় কখনও কলহ করিতেছেন, কখনও উচ্চ হাস্য করিতেছেন। মুখের দর্পণও ঘুচিয়া গিয়াছে; প্রগল্‌ভ শাণিত বাক্যবাণে পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতেছেন। সখীরা পরম কৌতুকে এই রঙ্গ উপভোগ করিতেছে।

ওয়াইপ্

খেলা শেষ হইতেছে। মহারাজের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার অবস্থা ভাল নয়। তবু তিনি বীরের স্থায় শেষ পর্য্যন্ত লড়িতেছেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না; বিজয়লক্ষ্মী রাণী ভানুমতীকেই কৃপা করিলেন। বাজি শেষ হইল

উচ্ছ্বসিত হাস্যে ভানুমতী বলিলেন—

ভানুমতী : মহারাজ, আবার আপনি হেরে গেলেন!

বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত বিমর্ষভাবে এক পাত্র সুরা পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর কপট ক্রোধের ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : অয়ি দর্পিতা বিজয়িনি, তোমার বড় অহঙ্কার হয়েছে! আচ্ছা, আর একদিন তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করব।—এখন তোমার পণ দাবী কর।

ভানুমতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। কুহক-মধুর স্বরে বলিলেন—

ভানুমতী : এখন নয় আর্য্যপুত্র। আজ রাত্রে—নিভৃতে—আমার বর ভিক্ষা চেয়ে নেব।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চক্ষু দুটিও প্রীতহাস্যে ভরিয়া উঠিল।

ফেড্ আউট : ফেড ইন্

পুরঃসীমার অন্তর্ভুক্ত বিহারভূমি; অদূরে অবরোধের তোরণদ্বার দেখা যাইতেছে

বৃক্ষগুল্মাদিশোভিত বিহারভূমির উপর দিয়া কালিদাস ও মালিনী অবরোধের

পানে চলিয়াছেন। কালিদাসের বাহুতলে অসমাপ্ত কুমারসম্ভবের পুঁথি। মালিনী সাবধান সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে।

কবি মৃদু হাসিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতেও বিশেষ সতর্কতা নাই, তিনি যেন মালিনীর এই ছেলেমানুষী কাণ্ডে লিপ্ত হইয়া একটু আমোদ উপভোগ করিতেছেন মাত্র। ক্রমে দু'জনে অবরোধ দ্বারের অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালিনী সংহতকণ্ঠে বলিল—

মালিনী: আস্তে! সামনেই দেউড়ি।

কালিদাস উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমাদের পূর্বপরিচিত নবযুবক শাস্ত্রীটি শূলহস্তে পাহারায় নিযুক্ত—আর কেহ নাই।

মালিনী দ্রুত-অনুচ্চকণ্ঠে কালিদাসকে কিছু উপদেশ দিয়া একাকিনী তোরণের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস বৃক্ষকাণ্ডের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রক্ষী দ্বারের সম্মুখে পরিক্রমণ করিতেছিল, মালিনীকে আসিতে দেখিয়া একগাল হাসিল। মালিনী পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর সশঙ্ক ভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া নিজ ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখিল।

রক্ষী ঘোর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—

রক্ষী: কি হয়েছে! অমন করছ কেন?

মালিনী: চুপ্—চেঁচিও না। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি—

রক্ষী: কী জিনিস?

মালিনী: (রহস্যপূর্ণ ভাবে) লাড্ডু!

কোঁচড়ের উপর হাত রাখিয়া মালিনী ইঙ্গিতে জানাইল যে লাড়ু ঐখানে লুকাইত আছে। রক্ষীর মুখের ভাব আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রক্ষী : অ্যাঁ! লাড্ডু!—আমার জন্যে এনেছ! দেখি দেখি!

মালিনী মাথা নাড়িল

মালিনী : এখানে নয়। খাবে তো ওদিকে চল—ঐ মল্লিকা ঝাড়ের আড়ালে।

লাড়ু খাইবার জন্য মল্লিকা-ঝাড়ের আড়ালে যাইবার কী প্রয়োজন? কিম্বা মালিনীর মনে আরও কিছু আছে! উৎসাহে রক্ষী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দ্বার ছাড়িয়াই বা যায় কি করিয়া?

রক্ষী : তা—তা—দেউড়ি খালি থাকবে?

মালিনী : তাতে কি হয়েছে? এ সময় কেউ আসবে না।

রক্ষী : তা আসে না বটে—কিন্তু কঞ্চুকী মশাই—; কাজ নেই মালিনী, তুমি লাড্ডু দাও, আমি এখানে দাঁড়িয়েই খাই।

মালিনী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল

মালিনী : দেউড়িতে দাঁড়িয়ে লাড্ডু খাবে? কেউ যদি দেখে ফেলে কি ভাববে বল দেখি!—

রক্ষী : তাও বটে। কিন্তু উপায় কি বলো? দেউড়ি ছাড়া যে বারণ।

মালিনী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল

মালিনী ঃ বেশ, কাজ নেই তোমার লাড্ডু খেয়ে—আমি আর কাউকে খাওয়াব। এত যত্ন করে নিজের হাতে তৈরি করেছিলুম—

রক্ষী ঃ না না মালিনী, তোমার লাড্ডু খাচ্ছি—চল কোথায় যাবে।

দেয়ালের গায়ে বল্লম হেলাইয়া রাখিয়া রক্ষী মালিনীর পিছনে চলিল। ওদিকে কালিদাস গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন। তোরণ হইতে প্রায় বিশ কদম দক্ষিণে একটি মল্লিকার ঝোপ ছিল, মালিনী ও রক্ষী তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সাবধানে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মালিনী রক্ষীকে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া দাঁড় করাইল। রক্ষী ব্যাপার না বুঝিয়া বিস্ময়ভরে মালিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মালিনী ঃ হয়েছে। এবার তুমি চোখ বোজো।

রক্ষী ঃ চোখ বুজ্‌ব ? কেন ?

মালিনী ধমক দিয়া বলিল—

মালিনী ঃ যা বলছি কর। আর, যতক্ষণ হুকুম না দিই, চোখ খুল্‌বে না।

রক্ষী চক্ষু মুদিত করিল। না করিয়াই বা উপায় কী ? লাড্ডুর লোভ যতটা না হোক, মালিনীকে প্রসন্ন রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। সে আবার একটুতেই চটিয়া যায়।

মালিনীর কিন্তু রক্ষীকে বিশ্বাস নাই, কে জানে হয়তো চোখের পাতার ফাঁকে দেখিতেছে। মালিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা

করিল। না, চোখ বুজিয়াই আছে, দেখিতেছে না। তখন মালিনী হাত তুলিয়া কালিদাসকে ইসারা করিল।

কালিদাস বৃক্ষতল হইতে বাহির হইয়া গুটি গুটি অরক্ষিত দ্বারের দিকে চলিলেন

ওদিকে রক্ষী চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—

রক্ষী: কি হ'ল? লাড্ডু কই?

মালিনী চকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—

মালিনী: এই যে। হাঁ কর।

রক্ষী হাঁ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুদুটিও খুলিয়া গেল। কালিদাস তখনও অর্দ্ধপথে; মালিনী ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল—

মালিনী: ও কি করছ! চোখ বন্ধ কর—চোখ বন্ধ কর!

রক্ষী চোখ বন্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ'টিও বুজিয়া গেল। মালিনী গলা বাড়াইয়া দেখিল কালিদাস নির্ব্বিঘ্নে তোরণ প্রবেশ করিলেন। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে রক্ষীর মুখের পানে চাহিল, হাসিয়া বলিল—

মালিনী: নাও—এবার মুখ খোলো।

রক্ষী যুগপৎ চক্ষু ও মুখ খুলিল

মালিনী: দূর! হ'ল না। চোখ বন্ধ, মুখ খোলা—এই রকম—বুঝলে?

মালিনী প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও রক্ষী কৃতকার্য্য হইল না ; হাঁ করিলেই চক্ষু খুলিয়া যায়। মালিনী হাসিতে লাগিল। রক্ষী কাতর স্বরে বলিল—

রক্ষী : কি করি—হচ্চে না যে !

মালিনী : তা হ'লে লাড্ডু পেলে না—

হাসিতে হাসিতে মালিনী দ্বারের দিকে চলিল, অৰ্দ্ধপথে থামিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—

মালিনী : তুমি ততক্ষণ অভ্যেস কর। ফিরে এসে যদি দেখি ঠিক হয়েছে তখন লাড্ডু পাবে।

মালিনী অবরোধের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল। রক্ষী বিমর্ষমুখে ফিরিয়া আসিয়া বল্লমটি তুলিয়া লইল, তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গভীর মনঃসংযোগে চক্ষু মুদিত রাখিয়া মুখব্যাদান করিবার দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল।

কাট্।

অবরোধের অভ্যন্তরে একটি উদ্যান। মহাদেবী ভানুমতীর সখী কিঙ্করীর সংখ্যা কম নয়—প্রায় গুটিপঞ্চাশ। তাহারা সকলেই আজ উদ্যানে আসিয়া জমিয়াছে। কেহ বৃক্ষশাখা লম্বিত ঝুলায় ঝুলিতে ঝুলিতে গান গাহিতেছে ; এক ঝাঁক যুবতী ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে ; কোথাও দুইটি সখী পাশাপাশি বসিয়া মালা গাঁথিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে।

দূর হইতে কালিদাস তাহাদের দেখিতে পাইয়া সেইদিকেই চলিয়াছিলেন, পিছন হইতে মালিনী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর

একটু হইলেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল ; অবরোধের মধ্যে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে সখীরা কেহ দেখিয়া ফেলিলে আর রক্ষা থাকিত না ! মালিনী দৃঢ়ভাবে কালিদাসের হাত ধরিয়া তাঁহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

ওয়াইপ্

রাণী ভানুমতীর কক্ষ। লূতাজালের মত সূক্ষ্ম একটি তিরস্করিণীর দ্বারা ঘরটি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক ভাগে রাণীর বসিবার আসন, অন্য ভাগে কালিদাসের বসিবার জন্য একটি মৃগচর্ম্ম ও তাহার সম্মুখে পুঁথি রাখিবার নিম্ন কাষ্ঠাসন। ভানুমতী নিজ আসনে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

ত্বরিত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে মালিনী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ; একবার ঘরের চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালনে রাণীকে জানাইল যে কালিদাস আসিয়াছেন। রাণীও বেশবাস সম্বরণপুর্ব্বক ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন। তখন মালিনী পাশের দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কালিদাস অলিন্দে অপেক্ষা করিতেছিলেন, দ্বারের সম্মুখে আসিলেন ; উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালিনী ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রাণীকে দেখিতে পাইয়া কালিদাস হাত তুলিয়া সংযতকণ্ঠে কেবল বলিলেন—

কালিদাস : স্বস্তি।

কালিদাসের প্রশান্ত অপ্রগল্‌ভ মুখচ্ছবি, তাঁহার অনাড়ম্বর হ্রস্বোক্তি ভানুমতীর ভাল লাগিল ; মনের ঔৎসুক্যও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্মিতমুখে হস্ত প্রসারণ করিয়া কবিকে বসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন।

কালিদাস আসনে উপবেশন করিয়া পুঁথির বাঁধন খুলিতে লাগিলেন ;

মালিনী অনতিদূরে মেঝের উপর বসিল

কালিদাস

কাট্ ।

অবরোধের উদ্যানে রাণীর সখীরা পূর্ব্ববৎ গান গাহিতেছে, ঝুলায় ঝুলিতেছে, ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে। একটি সখী কোমরে আঁচল জড়াইয়া নাচিতেছে, অন্য কয়েকটি তরুণী তাহাকে ঘিরিয়া কর-কঙ্কণ বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

"ও পথে দিস্‌নে পা
দিস্‌নে পা লো সই
মনে তোর রইবে না
(সুখ) রইবে না লো সই—
যদি বা মন বাঁচে,
কালো তোর হবে সোনার গা লো সই—"

কাট্ ।

ভানুমতীর কক্ষে কুমারসম্ভব পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। ভানুমতী করলগ্ন কপোলে শুনিতেছেন ; প্রতি শ্লোকের অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু কবির মুখের পানে তুলিতেছেন। কোথা হইতে আসিল এই অখ্যাতনামা ঐন্দ্রজালিক ! এই তরুণ কথা-শিল্পী !

কালিদাস পড়িতেছেন—উমার রূপবর্ণন—

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদযা চান্দ্রমসীব লেখা—"

কাট্ ।

উপরি উক্ত কক্ষের পাশে একটি গুপ্ত অলিন্দ—দেখিতে কতকটা সুড়ঙ্গের মত। প্রাচীরগাত্রে মাঝে মাঝে রন্ধ্র আছে ; সেই রন্ধ্রপথে কক্ষের অভ্যন্তর

পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। অবরোধের প্রতি কক্ষে যাহাতে কঞ্চুকী নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য রাখিতে পারে এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

রাণীর একটি সহচরী—নাম ভ্রমরী—পা টিপিয়া অলিন্দ পথে আসিতেছে। একটি রন্ধ্রের নিকটে আসিয়া সে কান পাতিয়া শুনিল—কক্ষ হইতে একটানা গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে। তখন ভ্রমরী সন্তর্পণে রন্ধ্র পথে উঁকি মারিল।

রন্ধ্রটি নীচের দিকে ঢালু। ভ্রমরী কক্ষের কিয়দংশ দেখিতে পাইল। কালিদাস কাব্য পাঠ করিতেছেন—স্বচ্ছ তিরস্করিণীর অন্তরালে রাণী উপবিষ্টা। মালিনী রন্ধ্রের দৃষ্টিচক্রের বাহিরে ছিল বলিয়া ভ্রমরী তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রমরী রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল ; উত্তেজনা-বিবৃত চক্ষে চাহিয়া নিজ তর্জ্জনী দংশন করিল ; তারপর লঘু দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

[অতঃপর কয়েকটি মণ্টাজ্ দ্বারা পরবর্ত্তী ঘটনার পরিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইবে]

উদ্যানের এক অংশ। ভ্রমরী তাহার প্রিয় বয়স্যা মধুশ্রীকে একান্তে লইয়া গিয়া উত্তেজিত হ্রস্বকণ্ঠে কথা বলিতেছে। নেপথ্যে আবহ যন্ত্রসঙ্গীত চলিয়াছে। ভ্রমরীর কথা শেষ হইলে মধুশ্রী গণ্ডে হস্ত রাখিয়া বিস্ময় জ্ঞাপন করিল।

ওয়াইপ্।

উদ্যানের অন্য অংশ। একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মধুশ্রী তাহার প্রিয়সখী মঞ্জুলাকে সদ্য-প্রাপ্ত সংবাদটি শুনাইতেছে। নেপথ্যে আবহসঙ্গীত চলিয়াছে।

ওয়াইপ্ ।

প্রাসাদমূলে এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া মঞ্জুলা রাজভবনের একটি বর্ষীয়সী পরিচারিকাকে গোপন খবরটি দিতেছে। নেপথ্যে যন্ত্র-সঙ্গীত।

ওয়াইপ্ ।

কঞ্চুকীর কক্ষ। পরিচারিকা কঞ্চুকী মহাশয়ের নিকট সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। সম্ভবত পরিচারিকা কঞ্চুকীর গুপ্তচর। কঞ্চুকীর স্বাভাবিক তিক্ত মুখভাব সংবাদ শ্রবণে যেন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কুঞ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[মণ্টাজ এইখানে শেষ হইবে]

কাট্ ।

ভানুমতীর কক্ষে কালিদাস রতিবিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ পাঠ শেষ করিতেছেন। এই পর্য্যন্তই লেখা হইয়াছে। রতির নব-বৈধব্যের মর্ম্মান্তিক বর্ণনা শুনিয়া ভানুমতী কাঁদিয়াছেন; তাঁহার চক্ষু দুটি অরুণাভ। মালিনীর গুস্থলও অশ্রুধারায় অভিষিক্ত।

পাঠ শেষ করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ভানুমতী আর্দ্র ভদ্গত কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : ধন্য কবি! ধন্য মহাভাগ!—

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কঞ্চুকী রন্ধ্রমুখে উঁকি মারিতেছে। কক্ষ হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল ; রাণী বলিতেছেন—

ভানুমতী: আবার কতদিনে দর্শন পাব ?

কালিদাস: দেবি, আপনার অনুগ্রহ লাভ করে' আমি কৃতার্থ ; যখন আদেশ করবেন তখনই আসব। কিন্তু কাব্য শেষ হতে এখনও বিলম্ব আছে—

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষ। কালিদাস পুঁথি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন ভানুমতী আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—

ভানুমতী: না না, শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না—

কালিদাস: (স্মিতমুখে) বেশ, পরের সর্গ শেষ করে' আমি আবার আসব।

যুক্ত করে শির অবনত করিয়া কালিদাস ভানুমতীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন, তারপর মালিনীর দিকে ফিরিলেন

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কঞ্চুকী রন্ধ্রমুখে উঁকি মারিতেছে ; কিন্তু কক্ষ হইতে আর কোনও শব্দ আসিল না। তখন সে রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিয়া ক্ষণকাল ভ্রূবদ্ধ ললাটে চিন্তা করিল। তারপর শিখার গ্রন্থি খুলিয়া আবার তাহা বাঁধিতে বাঁধিতে প্রস্থান করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। একটি বৃহৎ কক্ষ; নানাবিধ বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে প্রাচীরগুলি সুসজ্জিত। এই অস্ত্রগুলির উপর মহারাজের যত্ন ও মমতার অন্ত নাই; তিনি স্বহস্তে এগুলিকে প্রতিনিয়ত মার্জ্জন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে, কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদিকার প্রান্তে বসিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তরবারিটি পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার পাশে ঈষৎ পশ্চাতে কঞ্চুকী দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে। রাজার মুখ বৈশাখী মেঘের মত অন্ধকার; চোখে মাঝে মাঝে বিদ্যুদ্বহ্নির চমক খেলিতেছে। তিনি কিন্তু কঞ্চুকীর মুখের পানে তাকাইতেছেন না।

কঞ্চুকী বার্ত্তা শেষ করিয়া বলিল—

কঞ্চুকী: যেখানে স্বয়ং মহাদেবী—এঁ—লিপ্ত রয়েছেন সেখানে আমার স্বাধীনভাবে কিছু করবার অধিকার নেই। এখন দেবপাদ মহারাজের যা অভিরুচি।

মহারাজ তাঁহার চক্ষু তরবারি হইতে তুলিয়া ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন; কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার খরধার দৃষ্টি কঞ্চুকীর মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তারপর আবার তরবারিতে মনোনিবেশ করিয়া রাজা সংযত ধীর কণ্ঠে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্য: এখন কিছু করবার দরকার নেই। শুধু লক্ষ্য রাখবে। সে—সে-ব্যক্তি আবার যদি আসে, তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবে।

কঞ্চুকী মাথা ঝুঁকাইয়া সম্মতি জানাইল। তাহার বিকৃত মনোবৃত্তি যে এই ব্যাপারে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার স্বভাব-তিক্ত মুখ দেখিয়াও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ডিজল্‌ভ্‌।

স্ফটিক নির্ম্মিত একটি বালু-ঘটিকা। ডমরুর ন্যায় আকৃতি; উপরের গোলক হইতে নিম্নতন গোলকে বালুর শীর্ণ ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

উপরের ঘটনার পর কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

ভানুমতীর কক্ষ। কবির জন্য মৃগচর্ম্ম ও পুঁথি রাখিবার কাষ্ঠাসন যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছে। ভানুমতী নতজানু হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে কাষ্ঠাসনটি ফুল দিয়া সাজাইয়া দিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

মালিনী দ্বারের নিকট প্রবেশ করিয়া মস্তক-সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিল। প্রত্যুত্তরে ভানুমতী ঘাড় নাড়িলেন, তারপর তিরস্করিনীর আড়ালে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।

মালিনী হাতছানি দিয়া কবিকে ডাকিল। কবিও পুঁথিহস্তে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কাট্‌।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। রাজা একাকী বসিয়া একটি চর্ম্মনির্ম্মিত গোলাকৃতি ঢাল পরিষ্কার করিতেছেন।

কঞ্চুকী বাহির হইতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল; মহারাজ তাহার দিকে

মুখ তুলিলেন। কঞ্চুকী কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, যেন রাজার অকথিত প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল।

রাজা ঢাল রাখিয়া দ্বারের কাছে গেলেন। দ্বারের পাশে প্রাচীরে একটি কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছিল, কঞ্চুকী সেটি তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একবার কঞ্চুকীকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর তরবারি স্বহস্তে লইয়া কক্ষের বাহির হইলেন। কঞ্চুকী পিছে পিছে চলিল।

কাট্।

রাণীর কক্ষে কালিদাস পার্ব্বতীর তপস্যা অংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। কপোল-ন্যস্ত-হস্তা ভানুমতী অবহিত হইয়া শুনিতেছেন; তাঁহার দুই চক্ষে নিবিড় রস-তন্ময়তার স্বপ্নাভাস।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কোষবদ্ধ তরবারি হস্তে মহারাজ আসিতেছেন, পশ্চাতে কঞ্চুকী। কক্ষের সম্মুখে আসিয়া মহারাজ দাঁড়াইলেন, রন্ধ্র পথে একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন; তারপর সেইদিকে কর্ণ ফিরাইয়া রন্ধ্রাগত স্বর গুঞ্জন শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ পূর্ব্ববৎ কঠিন ও ভাবাবহ হইয়া রহিল।

রন্ধ্র পথে ছন্দোবদ্ধ শব্দের অস্পষ্ট গুঞ্জরণ আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে রাজা প্রাচীরে স্কন্ধভার অর্পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হাতের তরবারিটা অস্বস্তি-দায়ক, সেটা কয়েকবার এহাত-ওহাত করিয়া শেষে কঞ্চুকীর হাতে ধরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কঞ্চুকী মহারাজের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল; কিন্তু তাঁহার বজ্র কঠিন মুখ দেখিয়া মানসিক ক্রিয়া অনুমান করিতে পারিল না। সে ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—কী আশ্চর্য্য! মহারাজ এখনও ক্ষেপিয়া যাইতেছেন না কেন?

ডিজল্‌ভ্‌।

রাণীর কক্ষ। কালিদাস পাঠ শেষ করিয়া পুঁথি বাঁধিতেছেন। রাণীর দিকে মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—

কালিদাস : এই পর্য্যন্তই হয়েছে মহারাণী।

ভানুমতী প্রশ্ন করিলেন—

ভানুমতী : কবি, বাকিটুকু কতদিনে শুনতে পাব? আমার মন যে আর ধৈর্য্য মান্‌ছে না? কবে কাব্য শেষ হবে?

কালিদাস : মহাকাল জানেন। তিনিই স্রষ্টা, আমি অনুলেখক মাত্র। এবার অনুমতি দিন, আর্য্যা।

কবি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

কাট্‌।

গুপ্ত অলিন্দ। রাজা এতক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়া ছিলেন, হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কঞ্চুকী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাডাতাড়ি তরবারিটি বাড়াইয়া দিল। রাজা তরবারির পানে আরক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সেটি নিজ হস্তে লইলেন; এক ঝট্‌কায় উহা কোষমুক্ত করিয়া, কোষ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে বাহিরে চলিলেন।

কঞ্চুকীর মনে আশা জাগিল, এতক্ষণে রাজার রক্ত গরম হইয়াছে। উৎফুল্ল মুখে কোষটি কুড়াইয়া লইয়া সে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

কাট্‌।

রাণীর কক্ষ। কালিদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ভানুমতীও দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কবিকে বিদায় দিতেছেন। মালিনী দ্বারের দিকে চলিয়াছে; কবিকে অবরোধের বাহির পর্য্যন্ত সাবধানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

সহসা প্রবল তাড়নে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। মুক্ত তরবারি হস্তে বিক্রমাদিত্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মালিনী সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া একটি আর্ত্ত চীৎকার কণ্ঠমধ্যে রোধ করিল।

রাজা প্রবেশ করিলেন; পশ্চাতে কঞ্চুকী। রাজার তীব্রোজ্জ্বল চক্ষু একবার কক্ষের চারিদিকে বিচরণ করিল: মালিনী এক কোণে মিশিয়া গিয়া থরথর কাঁপিতেছে; কালিদাস তাঁহার নিজের ভাষায় 'চিত্রাপিতারম্ভ' ভাবে দাঁড়াইয়া; মহাদেবী ভানুমতী প্রশান্তনেত্রে রাজার পানে চাহিয়া আছেন, যেন তাঁহার মন হইতে কাব্যের ঘোর এখনও কাটে নাই।

কবির দিকে একবার কঠোর দৃক্‌পাত করিয়া রাজা ভানুমতীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, দুইজন নিস্পলক স্থির দৃষ্টিতে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে রাণীর মুখে ঈষৎ কৌতুক হাস্য দেখা দিল। রাজা অন্তর্গূঢ় চাপা গর্জ্জনে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: মহাদেবি ভানুমতি, এই কি তোমার উচিত কাজ হয়েছে!

ভানুমতী: কী কাজ আর্য্যপুত্র?

বিক্রমাদিত্য: এই দেবভোগ্য কবিতা তুমি একা-একা ভোগ করছ! আমাকে পর্য্যন্ত ভাগ দিতে পারলে না! এত কৃপণ তুমি!

কক্ষ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কালিদাসের মুখে-চোখে নবোদিত বিস্ময়। কঞ্চুকী হঠাৎ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া খাবি খাওয়ার মত শব্দ করিয়া হাঁপাতে আরম্ভ করিল। মহারাজ তাহার দিকে পরুষ দৃষ্টি ফিরাইলেন, কঞ্চুকীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া উঠিল—

কঞ্চুকী : মহারাজ, আমি—আমি বুঝতে পারিনি—

বিক্রমাদিত্য ঈষৎ চিন্তা করিবার ভাণ করিলেন।

বিক্রমাদিত্য : সম্ভব। তুমি জান্‌তে না যে পাশার বাজি জিতে মহাদেবী আমার কাছ থেকে এই পণ চেয়ে নিয়েছিলেন। যাও, তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু—ভবিষ্যতে মহাদেবী ভানুমতী সম্বন্ধে মনে মনেও আর এমন ধৃষ্টতা কোরো না।

বিক্রমাদিত্য হাতের তরবারিটা কঞ্চুকীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মসৃণ মেঝের উপর পড়িয়া তরবারি পিছলাইয়া কঞ্চুকীর দুই পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গেল। কঞ্চুকী লাফাইয়া উঠিল, তারপর তরবারি কুড়াইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। তিনি কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন, কবির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : তরুণ কবি, তোমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করা আমার পক্ষে আরও কঠিন। তুমি আমাকে উপেক্ষা করে রাণীকে তোমার কাব্য শুনিয়েছ! তোমার কি বিশ্বাস বিক্রমাদিত্য শুধু যুদ্ধ করতেই জানে, কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না?

কালিদাস ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাস : মহারাজ—আমি—

বিক্রমাদিত্য কপট ক্রোধে তর্জ্জনী তুলিলেন।

তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার সভার সভা-কবি হ'লে।

কালিদাস বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

কালিদাস : না না মহারাজ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই।

বিক্রমাদিত্য : সেকথা বিশ্ববাসী বিচার করুক। আগামী বসন্তোৎসবের দিন আমি মহাসভা আহ্বান করব, দেশ দেশান্তরের রাজা পণ্ডিত রসজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করব—তাঁরা এসে তোমার গান শুনবেন।

কালিদাস অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন, রাজা পুনশ্চ বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : কিন্তু বসন্তের কোকিলের মত তুমি কোথা থেকে এলে কবি? কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিলে? কোথায় তোমার গৃহ?

মালিনী এতক্ষণে রাজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কালিদাস ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া সে আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—

মালিনী : উনি যে নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছেন, সেইখানেই থাকেন!

রাজা ঘাড় ফিরাইয়া মালিনীকে দেখিলেন, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইলেন—

বিক্রমাদিত্য: দূতী! দূতী! তুমি ফুলের বেসাতি কর, না—ভোমরার?

মালিনী: (ঈষৎ ভয় পাইয়া) ফ্-ফুলের, মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য: হুঁ। ভেবেছ তোমার কথা আমি কিছু জানিনা! সব জানি। আর শাস্তিও দেব তেমনি। কঞ্চুকীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব—তখন বুঝবে।

পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মালিনী হাসিল রাজা কালিদাসের পানে ফিরিলেন—

বিক্রমাদিত্য: কিন্তু নদীর তীরে কুঁড়ে ঘর! তা তো হতে পারেনা কবি। তোমার জন্যে নগরে প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হবে, তুমি সেখানেই থাকবে।

কালিদাস হাত যোড় করিলেন

কালিদাস: মহারাজ, আপনার অসীম কৃপা। কিন্তু আমার কুটীরে আমি পরম সুখে আছি।

বিক্রমাদিত্য: কিন্তু কবিকে বিষয় চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। নৈলে কবি কাব্য রচনা করবেন কি করে? অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ!

কালিদাস: মহারাজ, আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। মহাকাল আমাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক আমি কামনাও করিনা। মনের অভাবই অভাব মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য : ধন সম্পদ চাও না ?

কালিদাস: না মহারাজ। আমি মহাকালের সেবক। আমার দেবতা চির-নগ্ন, তাই তিনি চিরসুন্দর। আমি যেন চিরদিন আমার এই নগ্নসুন্দর দেবতার উপাসক থাকতে পারি।

রাজা মুগ্ধ প্রফুল্ল নেত্রে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্য : ধন্য কবি! তুমিই যথার্থ কবি!—কিন্তু—(মালিনীর দিকে ফিরিয়া) মালিনী তুমি বলতে পার, কবি তাঁর কুটীরে মনের সুখে আছেন ?

মালিনী কালিদাসের পানে চাহিল ; তাহার চক্ষু রসনিবিড় হইয়া আসিল। একটু হাসিয়া সে বলিল—

মালিনী : হ্যাঁ মহারাজ, মনের সুখে আছেন।

বিক্রমাদিত্য একটি নিশ্বাস ফেলিলেন

বিক্রমাদিত্য : ভাল। এবার তবে কাব্যপাঠ আরম্ভ হোক।

কালিদাস পুঁথি খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

অবন্তীর বিশাল রাজমন্ত্রাগারের একটি বৃহৎ কক্ষ। প্রায় পঞ্চাশজন মসীজীবী অনুলেখক সারি দিয়া ভূমির উপর বসিয়াছে। প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া ক্ষুদ্র অনুচ্চ কাষ্ঠাসন; তদুপরি মসীপাত্র ভূর্জ্জপত্রের কুণ্ডলী প্রভৃতি।

স্বয়ং জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ একটি লিখিত পত্র হস্তে লইয়া অনুলেখকগণের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন এবং পত্রটি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতেছেন. অনুলেখকগণ শুনিয়া শুনিয়া লিখিয়া চলিয়াছে—

জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ :···আগামী মধু-পূর্ণিমা তিথিতে মদন মহোৎসব-বাসরে—হুম্ হুম্—সভাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত—অহহ—কুমার সম্ভবম্ নামক মহাকাব্য অবন্তীর রাজ সভায় পঠিত হইবে। অথ শ্রীমানের—বিকল্পে শ্রীমতীর অহহহ—চরণ-রেণুকণা স্পর্শে অবন্তীর রাজসভা পবিত্র হোক—হুম্—

ওয়াইপ্।

মন্ত্রগৃহ। বিক্রমাদিত্য বসিয়া আছেন। তাহার একপাশে স্তূপীকৃত নিমন্ত্রণ-লিপির কুণ্ডলী; মহামন্ত্রী একটি করিয়া লিপি রাজার সম্মুখে ধরিতেছেন, দ্বিতীয় একটি কর্ম্মিক দ্রবীভূত জতু একটি ক্ষুদ্র দর্ব্বীতে লইয়া পত্রের উপর ঢালিয়া দিতেছে, মহারাজ তাহার উপর অঙ্গুরীয়-মুদ্রার ছাপ দিতেছেন।

বিক্রমাদিত্য :···উত্তরাপথে দক্ষিণাপথে যেখানে যত জ্ঞানী গুণী রসজ্ঞ আছেন—পুরুষ নারী—কেউ যেন বাদ না পড়ে—

ওয়াইপ্‌।

উজ্জয়িনী নগরীর পূর্ব্ব তোরণ। তোরণ হইতে তিনটি পথ বাহির হইয়াছে, দুইটি পথ প্রাকারের ধার ঘেঁষিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে গিয়াছে, তৃতীয়টি তীরের মত সিধা পূর্ব্বমুখে গিয়াছে।

পঞ্চাশজন অশ্বারোহী রাজদূত তোরণ হইতে বাহিরে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। পৃষ্ঠে আমন্ত্রণ-লিপির বস্ত্র-পেটিকা ঝুলিতেছে, অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য নাই।

গোপুরশীর্ষ হইতে দুন্দুভি ও বিষাণ বাজিয়া উঠিল। অমনি অশ্বারোহীর শ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, দুই দল উত্তরে ও দক্ষিণে চলিল, মাঝের দল ময়ূরসঞ্চারী গতিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল।

ডিজল্‌ভ্‌।

কুন্তলের রাজভবন ভূমি। পূর্ব্বোল্লিখিত সরোবরের মর্ম্মর সোপানের উপর রাজকুমারী একাকিনী বসিয়া আছেন। মুখে চোখে হতাশা ও নৈরাশ্য পদাঙ্ক মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে; কেশবেশ অযত্নবিন্যস্ত। বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন যেন তাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

সরোবরের জল বায়ুস্পর্শে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে; রাজকুমারী লীলাকমলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া জলে ফেলিতেছেন, কোনটি নৌকার মত ভাসিয়া যাইতেছে, কোনটি ডুবিতেছে।

অদূরে একটী তরুশাখায় হেলান দিয়া বিদ্যুল্লতা গান গাহিতেছে: তাহার গীত কতক রাজকুমারীর কানে যাইতেছে, কতক যাইতেছে না।

বিদ্যুল্লতা :

ভাস্‌ল আমার ভেলা—
সাগর-জলে নাগর-দোলা ওঠা-নামার খেলা
সেথা ভাস্‌ল আমার ভেলা।
অকূলে—কূল পাবে কিনা—কে জানে !
বাতাসে—বাজবে প্রলয় বীণা ?—কে জানে !
কে জানে আসবে রাতি, হারাবে সাথের সাথী
আঁধারে ঝড়-তুফানের বেলা
—ভাস্‌ল আমার ভেলা।

গান শেষ হইয়া গেল। রাজকুমারী তাঁহার ভাসমান পদ্মপলাশগুলির পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন—

রাজকুমারী : দিনের পর দিন···আজকের দিন শেষ হল··· আবার কাল আছে···তারপর আবার কাল···কালের কি অবধি নেই—?

রাজকুমারীর পশ্চাতে অনতিদূরে চতুরিকা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; তাহার হাতে কুণ্ডলিত নিমন্ত্রণ লিপি। ক্ষুব্ধমুখে একটু ইতস্তত করিয়া সে রাজকুমারীর পাশে আসিল, সোপানের পৈঠার উপর পা মুড়িয়া বসিতে বসিতে বলিল—

চতুরিকা : পিয়সহি, অবন্তী থেকে আমন্ত্রণ এসেছে—তোমার জন্যে স্বতন্ত্র লিপি—

নিরুৎসুকভাবে লিপি লইয়া রাজকুমারী উহার জতুমুদ্রা দেখিলেন, তারপর খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুরিকা বলিয়া চলিল—

চতুরিকা : মহারাজ সভা থেকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরও আলাদা নিমন্ত্রণ-লিপি এসেছে কিন্তু তিনি যেতে পারবেন না। বলে পাঠালেন, তুমি যদি যেতে চাও তিনি খুব খুশী হবেন।

লিপি পাঠ শেষ করিয়া রাজকুমারী আবার উহা কুণ্ডলাকারে জড়াইতে লাগিলেন, যেমন চতুরিকার কথা শুনিতে পান নাই এমনিভাবে জলের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঈষৎ তিক্ত হাসি তাঁহার মুখে দেখা দিল, তিনি লিপি জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু ফেলিলেন না। চতুরিকার দিকে ফিরিয়া অবসন্ন কণ্ঠে কহিলেন—

রাজকুমারী : পিতা সুখী হবেন? বেশ—যাব।

ডিজ্‌লভ্‌।

উজ্জয়িনীর পূর্ব্ব দ্বার, পুষ্প, পল্লব ও তোরণ মাল্যে শোভা পাইতেছে। আজ মদন মহোৎসব।

তিনটি পথ দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর মত মানুষ আসিয়া তোরণের রন্ধ্রমুখে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাজন্যগণ হস্তীর গলঘণ্টা বাজাইয়া মন্দ-মন্থর গমনে আসিতেছেন; যোদ্ধৃবেশধারী পদাতি, অশ্ব, এমন কি উষ্ট্রও আছে। মাঝে মাঝে দু'একটি চতুর্দ্দোলা আসিতেছে, সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর লঘু মেঘাবৃত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সম্ভ্রান্ত আর্য্যমহিলা।

একটি দোলা তো[illegible]মুখে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সহচর কেহ নাই। দোলার ক্ষীণাবরণের মধ্যে এক সুন্দরী বিমনা ভাবে করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন; দূর হইতে দেখিয়া অনুমান হয়—ইনি কুন্তলের রাজকুমারী।

কালিদাস

কাট্।

রাজসভার প্রবেশদ্বার। দ্বারে মহামন্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। অতিথিগণ একে একে দুয়ে দুয়ে আসিতেছেন, মহামন্ত্রী তাঁহাদের পদোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তিলক চন্দন ও গন্ধমাল্যে ভূষিত করিয়া সভার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতেছেন।

নেপথ্যে বসন্তরাগে মধুর বাঁশী বাজিতেছে।

কাট্।

সভার অভ্যন্তর। বক্তার বেদী ব্যতীত অন্য সব আসনগুলি ক্রমশ ভরিয়া উঠিতেছে। সন্নিধাতা কিঙ্করগণ সকলকে নির্দ্দিষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসাইতেছে।

ঊর্দ্ধে মহিলাদের মঞ্চেও অল্প শ্রোত্রী সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছে ;
তবে মহাদেবীর আসন এখনও শূন্য আছে।

কাট্।

কালিদাসের কুটীর প্রাঙ্গণ। কালিদাস সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, মালিনী তাহার ললাটে চন্দন পরাইয়া দিতেছে। মালিনীর চোখদুটি একটু অরুণাভ। যেন সে লুকাইয়া কাঁদিয়াছে। সে থাকিয়া থাকিয়া দন্তদ্বারা অধর চাপিয়া ধরিতেছে।

কুমারসম্ভবের পুঁথি বেদীর উপর রাখা ছিল ; তাহা কালিদাসের হাতে
তুলিয়া দিতে দিতে মালিনী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

মালিনী : এতদিন তুমি আমার কবি ছিলে, আজ থেকে সারা

পৃথিবীর কবি হলে। কত লোক তোমার গান শুনবে, ধন্যি ধন্যি করবে—

কালিদাস সলজ্জে একটু হাসিলেন।

কালিদাস: কী যে বল! আমার কাব্য লেখার চেষ্টা বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়ানো।—সবাই হয়তো হাসবে।

তাহার বিনয়-বচনে কান না দিয়া মালিনী বলিল-

মালিনী: আজ পৃথিবীর যত জ্ঞানী-গুণী সবাই তোমার গান শুনবে, কেবল আমিই শুনতে পাব না—

কালিদাস সবিস্ময়ে চোখ তুলিলেন।

কালিদাস: তুমি শুনতে পাবে না!—কেন?

মালিনী: সভায় কত রাজা রাণী, কত বড় বড় লোক এসেছেন, সেখানে আমাকে কে যায়গা দেবে কবি?

কালিদাসের মুখের ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিল: তিনি মালিনীর একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া ধীর স্বরে কহিলেন—

কালিদাস: রাজসভায় যদি তোমার যায়গা না হয়, তাহলে আমারও যায়গা হবে না। এস।

মালিনীর চক্ষুদুটি সহসা-উদ্গত অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিয়া উঠিল।

কালিদাস

ডিজলৃভ্ ।

রাজসভা। সকলে স্ব স্ব আসনে বসিয়াছেন, সভায় তিল ফেলিবার স্থান নাই। রাজ বেতালিক প্রধান বেদীর উপর যুক্ত করে দাঁড়াইয়া মহামান্য অতিথিগণের সাদর সম্ভাষণ গান করিতেছে। কিন্তু সেজন্য সভার জল্পনা গুঞ্জন শান্ত হয় নাই। সকলেই প্রতিবেশীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছে, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া সভার অপূর্ব্ব শিল্পশোভা দেখিতেছে, স্বেচ্ছামত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

উপরে মহিলামঞ্চও কলভাষিণী মহিলাপুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে মহাদেবীগণের স্বতন্ত্র আসন কিন্তু এখনও শূন্য।

বৈতালিক স্তবগান গাহিয়া চলিয়াছে।

মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে মহাদেবী ভানুমতীকে আসিতে দেখা গেল। তিনি কুন্তলরাজকুমারীর হাত ধরিয়া হাস্যালাপ করিতে করিতে আসিতেছেন। কুন্তল-কুমারীও সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত কথা কহিতেছেন। মনে হয় উৎসবের আবহাওয়ায় আসিয়া তাঁহার অবসাদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইয়াছে।

তাঁহারা স্বীয় আসনে গিয়া পাশাপাশি বসিলেন। রাজবংশজাতা আর কোনও মহিলা বোধ হয় আসেন নাই, একা কুন্তলকুমারীই আসিয়াছেন। সেকালের মহিলা-মহলে বিদ্যা-চর্চ্চার সমধিক অসদ্ভাব ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাই যে দুই চারিটি বিদুষী নারী দেখা দিতেন, তাঁহারা অতিমাত্রায় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিতেন।

বৈতালিকের স্তুতিগান শেষ হইয়া আসিতেছে।

মালিনী ভীরু-সসঙ্কোচপদে মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে আসিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। ভিতরে আসিয়া অন্যান্য মহিলাগণের সহিত একাসনে বসিবার সাহস নাই; সে দ্বারের কাছেই ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার হাতে একটি ফুলের মালা ছিল; অশোক ও যূথী দিয়া গঠিত; খানিকটা লাল, খানিকটা

শাদা। মালাগাছি লইয়াও বিপদ—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, পাছে কেহ হাসে। অবশেষে মালিনী মালাটি কোঁচড়ের মধ্যে লুকাইয়া দ্বারের পাশেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। এখান হইতে গলা বাড়াইলে নিম্নে বক্তার বেদী সহজেই দেখা যায়।

বৈতালিকের গান শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর রবে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়া সভাগৃহ মধ্যে তুমুল শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

'ওয়াইপ্'।

সভা একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, পাতা নড়িলে শব্দ শোনা যায়।

কালিদাস বেদীর উপর বসিয়াছেন ; সম্মুখে উন্মুক্ত পুঁথি। তিনি একবার প্রশান্ত চক্ষে সভার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তারপর মন্দ্র কণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিলেন—

কালিদাস : কুমারসম্ভবম্।—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ—'

মহিলামঞ্চের মধ্যস্থলে কুন্তলকুমারী নির্নিমেষ বিস্ফারিত নেত্রে নিম্নে কালিদাসের পানে চাহিয়া আছেন। এ কে? সেই মূর্ত্তি, সেই কণ্ঠস্বর! তবে কি—তবে কি—?

কালিদাসের উদার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—হিমালয়ের বর্ণনা—

কালিদাস :—'পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।'

কালিদাস

ডিজল্‌ভ্‌।

তুষারমৌলী হিমালয়ের কয়েকটি দৃশ্য। দূর হইতে একটি অধিত্যকা দেখা গেল ; তথায় একটি ক্ষুদ্র কুটীর ও লতা বিতান। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার পর মহেশ্বর এই নির্জ্জন স্থানে উগ্র তপস্যায় রত আছেন।

কালিদাস শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিয়াছেন, তাঁহার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর এই দৃশ্যগুলির উপর সঞ্চারিত হইতেছে।

কাট্‌।

রাজসভার দৃশ্য। বিশাল সভা চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে, কালিদাসের কণ্ঠস্বর এই নীরব একাগ্রতার মধ্যে মৃদঙ্গের ন্যায় মন্দ্রিত হইতেছে।

মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারী তন্দ্রাহতার মত বসিয়া শুনিতেছেন ; বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত, চক্ষু নিষ্পলক ; কখনও বক্ষ ভেদ করিয়া নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছে, কখনও গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতেছে ; তিনি জানিতেও পারিতেছেন না।

ওয়াইপ্‌।

হিমালয়ের অধিত্যকায় মহেশ্বরের কুটীর। লতাগৃহদ্বারে নন্দী প্রকোষ্ঠে হেমবেত্র লইয়া দণ্ডায়মান। বেদীর উপর যোগাসনে বসিয়া মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন।

মহেশ্বরের আকৃতির সহিত কালিদাসের আকৃতির কিছু সাদৃশ্য থাকিবে ; কাব্যে কবির নিজ জীবন বৃত্তান্ত যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছে ইহা তাহারই ইঙ্গিত।

বনপথ দিয়া গিরিকন্যা উমা কুটীরের পানে আসিতেছেন ; দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া কুন্তলকুমারী বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তে ফুল জল সমিধপূর্ণ পাত্র।

বেদীপ্রান্তে পৌঁছিয়া উমা নতজানু হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। শঙ্কর ধ্যানমগ্ন।

ডিজল্‌ভ্‌।

মেঘলোকে ইন্দ্রসভা। ইন্দ্র ও দেবগণ মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন। মদন ও বসন্ত প্রবেশ করিলেন। মদনের কণ্ঠে পুষ্পধনু, বসন্তের হস্তে চূত-মঞ্জরী।

ইন্দ্র সাদরে মদনের হাত ধরিয়া বলিলেন—

ইন্দ্র: এস বন্ধু, আমাদের দারুণ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।

কৈতববাদে স্ফীত হইয়া মদন সদর্পে বলিলেন—

মদন: আদেশ করুন দেবরাজ, আপনার প্রসাদে, অন্যে কোন ছার, স্বয়ং পিণাকপাণির ধ্যানভঙ্গ করতে পারি।

দেবতাগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মদন ঈষৎ ত্রস্ত ও চকিত হইয়া সকলের মুখের পানে চাহিলেন। সত্যই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে নাকি?

কাট্‌

রাজসভা। কালিদাস কাব্য পাঠ করিয়া চলিয়াছেন; সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছে।

মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারীর অবস্থা পূর্ব্ববৎ—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ভানুমতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া কাব্য-শ্রবণে মন দিলেন।

ওয়াইপ্

হিমালয়। সমস্ত প্রকৃতি শীত জর্জ্জর, তুষার কঠিন। বৃক্ষ নিষ্পত্র,
প্রাণীদের প্রাণ-চঞ্চলতা নাই

মহেশ্বরের তপোবনের সন্নিকটে একটি শাখাসর্ব্বস্ব বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। মদন ও বসন্তের সূক্ষ্ম-দেহ এই বৃক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি পুষ্পপল্লবে ভরিয়া উঠিল।

দূরে সহসা কোকিল-কাকলি শুনা গেল। হিমালয়ের
অকাল-বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে

সহসা-হরিতায়িত বনভূমির উপর কিন্নর মিথুন নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; পশু-পক্ষী ব্যাকুল বিস্ময়ে ছুটাছুটি ও কলকূজন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রমথগণ প্রমত্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

নন্দী এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে বিব্রত হইয়া চারিদিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তারপর ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া যেন জীবলোককে শাসন করিতে চাহিল—'চপলতা করিও না, মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন!'

মহেশ্বর বেদীর উপর যোগাসনে উপবিষ্ট। চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির, শ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী; নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত দেহ নিশ্চল।

রুম ঝুম মঞ্জীরের শব্দ কাছে আসিতেছে; উমা যথানিয়ত পূজার উপকরণ লইয়া আসিতেছেন। নন্দী সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

মহেশ্বরের ধ্যাননিদ্রা ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছে; তাঁহার নয়ন পল্লব ঈষৎ স্ফুরিত হইল।

লতা বিতানের এক কোণে লুকাইয়া মদন ধনুর্ব্বাণ হস্তে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। পার্ব্বতী আসিতেছেন—এই উপযুক্ত সময়।

পার্ব্বতী আসিয়া বেদীমূলে প্রণাম করিলেন, তারপর নতজানু অবস্থায় স্মিত-সলজ্জ চক্ষু দুটি মহেশ্বরের মুখের পানে তুলিলেন। মদনের অদৃশ্য উপস্থিতি উভয়ের অন্তরেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল ; মহাদেবের অরুণায়ত নেত্র পার্ব্বতীর মুখের উপর পড়িল।

মদন এই অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিল।

মহেশ্বরের তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়া ধক্ ধক্ করিয়া ললাটবহ্নি নির্গত হইল—কে রে তপোবিঘ্নকারী ! তিনি মদনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইল।

ভয়ব্যাকুলা উমা বেদীমূলে নতজানু হইয়া আছেন। মহেশ্বর বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে একবার রুদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর তাঁহার প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি সহসা শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাট্।

মদনভস্ম নামক সর্গ শেষ করিয়া কালিদাস ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন ; সভাও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এতগুলি মানুষ যে সভাগৃহে বসিয়া আছে শব্দ শুনিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কালিদাস পুঁথির পাতা উল্টাইলেন ; তারপর আবার নূতন সর্গ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

রতি বিলাপ শুনিয়া কুন্তলকুমারীর চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিল। ভানুমতী আবার নূতন করিয়া কাঁদিলেন। দ্বারপার্শ্বে মেঝেয় বসিয়া মালিনীও কাঁদিল। প্রিয়-বিয়োগে ব্যথা কাহাকে বলে এতদিনে সে বুঝিতে শিখিয়াছে।

ক্রমে কবি উমার তপস্যা অধ্যায়ে পৌঁছিলেন।

কালিদাস

ডিজল্‌ভ্‌.

হিমালয়ের গহন গিরিসঙ্কটের মধ্যে কুটীর রচনা করিয়া রাজনন্দিনী উমা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। পতিলাভার্থ তপস্যা ; পর্ণ—অর্থাৎ আপনা হইতে ঝরিয়া পড়া গাছের পাতা—তাহাও পার্ব্বতী আর আহার করেন না, তাই তাঁহার নাম হইয়াছে—অপর্ণা।

কৃচ্ছ্র সাধন বহুপ্রকার। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তপঃকৃশা পার্ব্বতী চারি কোণে অগ্নি জ্বালিয়া মধ্যস্থ আসনে বসিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকেন। ইহা পঞ্চাগ্নি তপস্যা। আবার শীতের হিম-কঠিন রাত্রে সরোবরের জলের উপর তুষারের আস্তরণ পড়ে ; সেই আস্তরণ ভিন্ন করিয়া উমা জলমধ্যে প্রবেশ করেন, আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া শীতরাত্রি অতিবাহিত হয়। সারা রাত্রি চন্দ্রের পানে চাহিয়া উমা চন্দ্রশেখরের মুখচ্ছবি ধ্যান করেন।

এই ভাবে কল্প কাটিয়া যায়। তারপর একদিন—

উমার কুটীরদ্বারে এক তরুণ সন্ন্যাসী দেখা দিলেন, ডাক দিলেন—

সন্ন্যাসী : অয়মহং ভোঃ।

উমা কুটিরে ছিলেন ; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন। সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি ভাল নয় ; লোলুপনেত্রে পার্ব্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

সন্ন্যাসী : সুন্দরী, তুমি কি জন্য তপস্যা করছ ?

পার্ব্বতী নতনয়নে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—

পার্ব্বতী : পতি লাভের জন্য।

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসী : কী আশ্চর্য্য ! তোমার মত ভুবনৈকা সুন্দরীকেও

পতি লাভের জন্য তপস্যা করতে হয় !—কে সেই মূঢ় যে নিজে এসে তোমার পায়ে পড়ে না ? তার নাম কি ?

পার্ব্বতী সন্ন্যাসীর চটুলতায় বিরক্ত হইলেন, গম্ভীর মুখে বলিলেন—

পার্ব্বতী : তাঁর নাম—শঙ্কর চন্দ্রশেখর শিব মহেশ্বর।

সন্ন্যাসী বিপুল বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া শেষে উচ্চ ব্যঙ্গ-হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী : কী বল্‌লে—'শিব মহেশ্বর ! সেই দিগম্বর উন্মাদটা —যে একপাল প্রেত-প্রমথ নিয়ে শ্মশানে মশানে নেচে বেড়ায়। তাকে তুমি পতিরূপে কামনা কর ! হাঃ হাঃ হাঃ !

সন্ন্যাসীর ব্যঙ্গ-বিস্ফুরিত অট্টহাস্য আবার ফাটিয়া পড়িল। পার্ব্বতীর মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল সন্ন্যাসীর প্রতি একটি জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

পার্ব্বতী : কপট সন্ন্যাসী, তোমার এত স্পর্দ্ধা তুমি শিবনিন্দা কর !—এখানে আর আমি থাকব না—

পার্ব্বতী কুটীরের পানে পা বাড়াইলেন।

পিছন হইতে শান্ত কোমল স্বর আসিল—

মহেশ্বর : উমা, ফিরে চাও—দেখ, আমি কে !

উমা ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চিত তনু থরথর কাঁপিতে লাগিল। শিলাকৃদ্ধগতি তটিনীর মত তিনি চলিয়া যাইতেও পারিলেন না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিলেন না।

সন্ন্যাসীর স্থানে স্বয়ং মহেশ্বর। তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বর বাহির হইল—

পার্ব্বতী : মহেশ্বর—!

কালিদাস

ডিজলভ্ ।

গিরিরাজ গৃহে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ

মহা আড়ম্বর : হুলস্থুল ব্যাপার। পুরন্ধ্রীগণ হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিতেছেন ; দেবগণ অন্তরীক্ষে স্তুতিগান করিতেছেন ; ভূতগণ কলকোলাহল করিয়া নাচিতেছে।

বিবাহ মণ্ডপের বর-বধূ পাশাপাশি বসিয়াছেন। রতি আসিয়া মহেশ্বরের পদতলে পড়িল। গৌরী একবার মহেশ্বরের পানে অনুনয়-ব্যঞ্জক অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আশুতোষ প্রীত হইয়া রতির মস্তকে হস্ত রাখিলেন ; অমনি মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়া যুক্তকরে দেব দম্পতির সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

বাদ্যোদ্যম, দেবতাদের স্তবগান ও প্রমথদের কলনিনাদ আরও গগনভেদী হইয়া উঠিল।

দীর্ঘ ডিজল্ভ্ ।

অবন্তীর রাজসভা। উপরিউক্ত কলকোলাহল রাজসভার জয়ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালিদাস কুমারসম্ভব পর্ব্ব শেষ করিয়াছেন।

কালিদাসের মস্তকে মালা বর্ষিত হইতেছে ; ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠে মালার স্তূপ জমিয়া উঠিল। তিনি যুক্তকরে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া এই সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিতেছেন।

উপরে মহিলামঞ্চেও চাঞ্চল্যের অন্ত নাই। কুঙ্কুম লাজাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি কবির মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। মহিলাদের রসনাও নীরব নাই, সকলেই একসঙ্গে কথা কহিতেছেন। সভা ভাঙ্গিয়াছে ; তাই মহিলারাও নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়াছেন কিন্তু আশু সভা ছাড়িয়া যাইবার কোনও লক্ষণই দেখা

যাইতেছে না। ভানুমতীও মাতিয়া উঠিয়াছেন, পরম উৎসাহভরে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন।

এই প্রমত্ত আনন্দ-অধীর জনতার এক প্রান্তে কুন্তলকুমারী মূর্চ্ছাহতার মত বসিয়া আছেন। তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টি নাই, কেবল অধরোষ্ঠ যেন কোন অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া উঠিতেছে।

কুন্তলকুমারী ঃ আমার স্বামী—আমার স্বামী—

মালিনীর অবস্থাও বিচিত্র ; সে একসঙ্গে হাসিতেছে কাঁদিতেছে ; একবার ছুটিয়া মঞ্চের প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতেছে, আবার দ্বারের কাছে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। মালিনী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর সাবধানে কোঁচড় হইতে মালাটি বাহির করিয়া কালিদাসের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল।

মালাটি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের মাথা গলিয়া গলায় পড়িল। কবি একবার স্মিত চক্ষু উপর দিকে তুলিলেন।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাজসভা শূন্য হইয়া গিয়াছে। নীচে একটিও লোক নাই ; উপরে একাকিনী কুন্তলকুমারী বসিয়া আছেন, আর মালিনী দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে কোন দুর্গম চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সহসা চমক ভাঙিয়া কুন্তলকুমারী দেখিলেন তিনি একা, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তিনি উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন, সকলে হয় তো তাঁহার ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়াছে ; কে কী ভাবিয়াছে কে জানে !

দ্বারের কাছে পৌঁছিতেই মালিনী চটকা ভাঙিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে বলিল—

মালিনী : দেবি, আমার ওপর মহাদেবী ভানুমতীর আজ্ঞা আছে, আপনি যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাব !

কুন্তলকুমারী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া কিন্তু তাঁহার গতি হ্রাস হইল ; ইতস্ততঃ করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তারপর মালিনীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন।

কুন্তলকুমারী : তুমি কি মহাদেবী ভানুমতীর কিঙ্করী ?

মালিনী : হাঁ দেবি, আমি তাঁর মালিনী।

কুন্তলকুমারী আসল প্রশ্নটি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গলা বুজিয়া গেল ; অতিকষ্টে উচ্চারণ করিলেন—

কুন্তলকুমারী : তুমি—তুমি—কবি শ্রীকালিদাস কোথায় থাকেন তুমি জানো ?

মালিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল ; কিন্তু সহজ সম্ভ্রমের স্বরেই বলিল—

মালিনী : হ্যাঁ দেবি, জানি।

আগ্রহের কাছে সঙ্কোচ পরাভূত হইল, কুন্তলকুমারী আর
এক পা কাছে আসিলেন

কুন্তলকুমারী : কোথায় থাকেন তিনি ?

' মালিনীর মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল

মালিনী : সিপ্রা নদীর ধারে নিজের হাতে কুঁড়ে ঘর তৈরি

করেছেন, সেইখানেই তিনি থাকেন। তাঁর খবর নিয়ে আপনার কি লাভ, দেবি? কবি বড় গরীব—দীনদরিদ্র, কিন্তু তিনি বড় মানুষের অনুগ্রহ নেন না।

কুন্তলকুমারী আর এক পা কাছে আসিলেন

কুন্তলকুমারী : তবে কি—তুমি কি—তাঁর সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে?

তিক্ত হাসিতে মালিনীর অধরপ্রান্ত নত হইয়া পড়িল

মালিনী : আছে দেবি—সামান্যই। তিনি মহাকবি, আমি মালিনী—তাঁর সঙ্গে আমার কতটুকু পরিচয় থাকতে পারে।

কুন্তলকুমারী কিছু শুনিলেন না, প্রবল আবেগভরে সহসা মালিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কুন্তলকুমারী : তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার?

মালিনীর চোখ হইতে যেন ঠুলি খসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে ভাবিয়াছিল রাজকুমারীর জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র কৌতূহল-প্রসূত। এখন সে সন্দেহ-তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা প্রশ্ন করিল—

মালিনী : তুমি কে? কবি তোমার কে?

অধরে অধর চাপিয়া কুন্তলকুমারী দুরন্ত বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিলেন—

কুন্তলকুমারী : তিনি—আমার স্বামী।

অতর্কিতে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া মানুষ যেমন ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যায়, মালিনীরও তদ্রূপ হইল। সে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া বলিল—

মালিনী: স্বামী—স্বামী!

তারপর ধীরে ধীরে তাহার উপলব্ধি ফিরিয়া আসিল। সে ঊর্দ্ধমুখে চক্ষু মুদিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—

মালিনী: ও—স্বামী! তাই! বুঝতে পেরেছি—এবার সব বুঝতে পেরেছি। দেবি, তিনি আপনার স্বামী, বুঝতে পেরেছি। তা, আপনি তাঁর কাছে যেতে চান?

কুন্তলকুমারী: হ্যাঁ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

মালিনীর বুকের ভিতরটা শূলবিদ্ধ সপের মত মুচ্‌ড়াইয়া উঠিতেছিল, সে একটু ব্যঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিল না—

মালিনী: দেবি, আপনি রাজার মেয়ে, সেখানে যাওয়া কি আপনার শোভা পাবে? সে একটা খড়ের কুঁড়ে ঘর···সেখানে কবি নিজের হাতে রেঁধে খান। এসব কি আপনি সহ্য করতে পারবেন রাজকুমারী?

রাজকুমারীর ভয় হইল মালিনী বুঝি তাঁহাকে লইয়া যাইবে না। তিনি ব্যগ্রভাবে হাতের কঙ্কণ খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী: তুমি বুঝতে পারছ না—আমি যে তাঁর স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। এই নাও পুরস্কার। দয়া করে আমাকে তাঁর কুটীরে নিয়ে চল।

কুন্তলকুমারী কঙ্কণটি মালিনীর হাতে গুঁজিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু মালিনী লইল না, বিতৃষ্ণার সহিত হাত সরাইয়া লইল ; ফিকা হাসিয়া বলিল—

মালিনী : থাক, দরকার নেই ; এইটুকু কাজের জন্যে আবার পুরস্কার কিসের। আসুন আমার সঙ্গে।

রাজকুমারীর জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই মালিনী চলিতে আরম্ভ করিল।

ওয়াইপ্।

কালিদাসের কুটীর প্রাঙ্গণ। কুন্তলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া মালিনী বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালিদাস নাই ; কেবল বেদীর উপর মালার স্তূপ পড়িয়া আছে, যেন কবি ক্লান্তভাবে এই সম্মানের বোঝা এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন।

মালিনী নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে ; তাঁহার মুখের ভাব দৃঢ়।
কুন্তলকুমারী যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন।
মালিনী ঘরের উদ্দেশ্যে ডাকিল—

মালিনী : কবি—ওগো কবি, তুমি কোথায় ?

ঘরের ভিতর হইতে কিন্তু সাড়া আসিল না। কুন্তলকুমারী শঙ্কিত দীননেত্রে মালিনীর পানে চাহিলেন।

মালাগুলি জড়াজড়ি হইয়া বেদীর উপর পড়িয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে মালিনী নিজের মালাটি বাহির করিয়া লইল ; পর-পর লাল ও শাদা ফুলে গাঁথা মালা—চিনিতে কষ্ট হইল না।

মালাটি রাজকুমারীর হাতে ধরাইয়া দিয়া মালিনী সহজ স্বরে বলিল—

মালিনী : নাও—আমার সঙ্গে এস। উনি ঘরেই আছেন, হয়তো পূজোয় বসেছেন।

মালিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, রাজকুমারী কম্প্রবক্ষে দ্বিধা জড়িত পদে তাহার পিছনে চলিলেন।

কুটীরে একটি মাত্র কক্ষ; আয়তনেও ক্ষুদ্র। এক পাশে কালিদাসের দীন শয্যা গুটানো রহিয়াছে, আর এক কোণে একটি দীপদণ্ড, তাহার পাশে অনুচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর লেখনী মসীপাত্র ও কুমারসম্ভবের পুঁথি রহিয়াছে। কিন্তু কালিদাস ঘরে নাই।

কুন্তলকুমারীর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল। তিনি পুঁথির সম্মুখে জানু ভাঙিয়া বসিয়া পড়িলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী : কোথায় তিনি ?

মালিনী সবই লক্ষ্য করিয়াছিল; বুঝি তাহার মনে একটু অনুকম্পাও জাগিয়াছিল। সে আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

মালিনী : তুমি থাক, আমি দেখছি। বুঝি নদীতে স্নান করতে গেছেন।

মালিনী চলিয়া গেলে রাজকুমারী হাতের মালাটি কুমারসম্ভবের পুঁথির উপর রাখিলেন; তারপর আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাট্ ।

সিপ্রার তীর। কালিদাস একাকী জলের ধারে বসিয়া আছেন ; মাঝে মাঝে একটি নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া অলস-হস্তে জলে ফেলিতেছেন। রাজসভার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়া নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার অনুভূতি তাঁহার অন্তরকে গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে। তাহার অন্তর্লোকে শ্রান্ত বাণী ধ্বনিত হইতেছে—

কেন ? কিসের জন্য ? কাহার জন্য ?

মালিনী নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল. কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হ্রস্ব-কণ্ঠে ডাকিল—

মালিনী : কবি !

কালিদাস চমকিয়া মুখ তুলিলেন।

কালিদাস : মালিনী !

মালিনী : কি ভাবা হচ্ছিল ?

কালিদাস একটু চুপ করিয়া রহিলেন।

কালিদাস : ভাবছিলাম—অতীতের কথা।

মালিনী কালিদাসের পাশে বসিল।

মালিনী। কিন্তু ভাবনা সুখের নয়—কেমন ?

কালিদাস : [ম্লান হাসিয়া] না, সুখের নয়। কিন্তু এ জগতে সকলে সুখ পায় না, মালিনী।

মালিনী বহমানা সিপ্রার জলে একটি নুড়ি ফেলিল।

মালিনী। না, সকলে পায় না। কিন্তু তুমি পাবে।

কালিদাস ভ্রূ তুলিয়া মালিনীর পানে চাহিলেন, তারপর মৃদু হাসিয়া
মাথা নাড়িলেন

কালিদাস : কীর্ত্তি যশ সম্মান—তাতে সুখ নেই মালিনী, সুখ আছে শুধু—প্রেমে।

মালিনীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল ; সে কালিদাসের পানে একবার চোখ পাতিয়া যেন তাঁহাকে দৃষ্টি-রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল। তারপর মুখ টিপিয়া বলিল—

মালিনী : প্রেমে জ্বালাও আছে কবি। নাও, ওঠ এখন ; তোমাকে ডাকতে এসেছিলুম। একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কালিদাস : ও—কে তিনি ?

মালিনী : আগে চলই না, দেখতে পাবে।

কালিদাসও উঠিবার উপক্রম করিলেন।

সিপ্রার পরপারে সূর্য্যদেব তখন দিগ্বলয় স্পর্শ করিতেছেন।

কাট।

প্রাঙ্গণ-দ্বারে পৌঁছিয়া কালিদাস দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন ; মালিনী কিন্তু ভিতরে আসিল না, চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কালিদাস তাহার দিকে ফিরিয়া চক্ষের সপ্রশ্ন ইঙ্গিতে তাহাকে ভিতরে আসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন, মালিনী কিন্তু অধর চাপিয়া একটু ফিকা হাসিয়া মাথা নাড়িল।

এই সময় কুটিরের ভিতর হইতে শঙ্খ-ধ্বনি হইল। কালিদাস মহা-বিস্ময়ে সেই দিকে ফিরিলেন। মালিনী এই অবকাশে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তাহার মুখের ব্যথা-বিদ্ধ হাসি কবাটের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কালিদাস দ্রুত অনুসন্ধিৎসায় কুটীরের পানে চলিয়াছিলেন—তাঁহার ঘরে শঙ্খ বাজায় কে? সহসা সম্মুখে এক মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ কি!

কুটীর হইতে রাজকুমারী বাহির হইয়া আসিতেছেন; গললগ্নীকৃত অঞ্চলপ্রান্ত, এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্তে মালা। কালিদাসকে দেখিয়া তাঁহার গতি শ্লথ হইল না; স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখ দুটিতে এখন আর জল নাই; অধর যদিও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তবু অধরপ্রান্তে যেন একটু হাসির আভাস নিদাঘ-বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইতেছে। তিনি প্রদীপটি বেদীর উপর রাখিলেন, তারপর দুই হাতে স্বামীর গলায় মালা পরাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন; অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী: আর্য্যপুত্র—

কালিদাস জড়মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন, যাহা কল্পনারও অতীত তাহাই চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও প্রায় লোপ পাইয়াছিল। এখন তিনি চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইলেন, নত হইয়া কুমারীকে দুই হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বিহ্বলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

কালিদাস: দেবি—দেবি—না না এ কি—পায়ের কাছে নয় দেবি—

কুণ্ডলকুমারী স্বামীর মুখের পানে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সেখানে ক্ষমা ও প্রীতি ভিন্ন আর কিছুরই স্থান নাই, এতটুকু অভিমান পর্য্যন্ত নাই। যে অশ্রুকে তিনি এত যত্নে চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা আর বাঁধন মানিতে চাহিল না, বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কালিদাস তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিতেই দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

ডিজল্‌ভ্।

কিছুক্ষণ কাটিয়াছে। ভাব-প্লাবনের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়াছে। উভয়ে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের হাত এখনও পরস্পর নিবদ্ধ।

কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন—

কালিদাস: কিন্তু দেবি, এ যে অসম্ভব। এই দীন কুটীরে—না না তা হতে পারে না—

কুন্তলকুমারী: যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।

কালিদাস: না না, তুমি রাজার মেয়ে—

কুন্তলকুমারী: আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে—এখন আমি শুধু মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।

কালিদাসের মুখে ক্ষোভের সহিত আনন্দও ফুটিয়া উঠিল

কালিদাস: কিন্তু—এই দারিদ্র্য—তুমি সহ্য করতে পারবে

কেন? চিরদিন বিলাসের মধ্যে পালিত হয়েছ—রাজদুহিতা তুমি—

কুন্তলকুমারী ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া চাহিলেন

কুন্তলকুমারী : আর্য্যপুত্র, আপনার উমাও তো রাজদুহিতা —গিরিরাজ সুতা ; কিন্তু কৈ তাঁকে মহেশ্বরের দীনকুটীরে পাঠাতে আপনার তো আপত্তি হয় নি! তবে?

কালিদাসের মুখে আর কথা বহিল না···রাজকুমারীর দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার বামস্কন্ধের উপর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সিপ্রার পরপারে দিগন্তের অস্তচ্ছটা ক্রমশ মেদুর হইয়া আসিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া কালিদাস সহসা নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। কুমারীও কালিদাসের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এক শ্রেণী উষ্ট্র সিপ্রার কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে।

কুমারী কালিদাসের পানে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন ; নিরীহভাবে প্রশ্ন করিলেন –

— কুন্তলকুমারী : ও কী, আর্য্যপুত্র?

কালিদাসের মুখেও একটু হাসি খেলিয়া গেল ; তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

কালিদাস : ওর নাম—উষ্ট্র!

কুন্তলকুমারী : কি --কি বললেন আর্য্যপুত্র?

কালিদাস তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করিলেন।

কালিদাস: না না উষ্ট নয়, উষ্ট নয়—উট্র!!

উভয়ে একসঙ্গে কলহাস্ত করিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর যে-হস্তটি স্কন্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল তাহা ক্রমে কালিদাসের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লইল। কালিদাসও কুমারীর মাথাটি নিজের বুকের উপর সবলে চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিলেন।

পূর্ব্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তখন বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

এইরূপে এক মধুপূর্ণিমার তিথিতে স্বয়ম্বর সভায় যে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছিল, আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সিপ্রাতীরের পর্ণকুটিরে তাহা পরিসমাপ্তি লাভ করিল।

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

ঝিন্দের বন্দী	...	...	২।০
ব্যোমকেশের গল্প	...	...	২৲
ব্যোমকেশের ডায়েরী	...	...	২৲
লাল পাঞ্জা	...	...	১৲
বিষকন্যা	...	...	২৲
বন্ধু	...	...	১।০
পথ বেঁধে দিল	...	...	১৷০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা